অনৈক্যে নয়
ঐক্যেই জয়

সাপ্তাহিক সংকলন

রেজি: ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-২১ | সোমবার, ০৩ ভাদ্র ১৪২১, ২১ শাওয়াল ১৪৩৫, ১৮ আগস্ট ২০১৪ ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

একচোখা দানব দাজ্জালের মধ্যপ্রাচ্য আগ্রাসনে নতুন কৌশল

ঐক্যহীন জাতির পরাজয় নিশ্চিত

সকল ধর্মের মর্ম কথা, সবার উর্ধ্বে মানবতা

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ
দৈনিক দেশেরপত্র
www.desherpatro.com

দৈনিক
দেশেরপত্র
মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

সম্পাদকীয়

একচোখা দানব দাজ্জালের মধ্যপ্রাচ্য আগ্রাসনে নতুন কৌশল

গত ২০ মার্চ ২০০৩ সাল থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ শক্তি আত্মস্বীকৃত মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ইরাক ও আফগানিস্তানকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। এভাবে তারা উভয় দেশের সরকারকে উৎখাত করে সেখানে একটি করে পুতুল সরকার [illegible] সেগুলিকে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' আখ্যা দিয়েছে। এই যুদ্ধের মূল লক্ষ্য যে খনিজ [illegible] দখল করা সেটা বলা বাহুল্য।

[illegible] আর আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কিছু সদস্যও প্রাণ হারিয়েছে, যার ফলে নাগরিকদের কাছে সরকারগুলির জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়েছিল যে তারা আর প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যাবে না, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি করে এরউএরউদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত বাঁধিয়ে দিতে হবে, এক দলের বিরুদ্ধে আরেক দলকে অস্ত্র সরবরাহ করবে, পশ্চিমাদের অস্ত্রব্যবসায়ও জমে উঠবে। তাই তারা সৃষ্টি করল 'আরব বসন্ত' নামক নতুন খেলা। উদ্দেশ্য মোসলেম বিশ্বের সরকারগুলিকে পরিবর্তন করা। এই আরব বসন্তের জেরে প্রায় পাঁচ লক্ষ মোসলেম দাবিদার প্রাণ হারালো, উদ্বাস্তু হলো কয়েক মিলিয়ন।

সাম্প্রতিক সময়ে আবার গজিয়ে উঠেছে ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আইসিস) নামের একটি সুন্নি জঙ্গি সংগঠন, যারা ইরাক, সিরিয়াজুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে বিরাট একটা ভূখণ্ড দখলে নিয়ে এসলামের তথাকথিত খেলাফত ঘোষণা করে ফেলেছে। যদিও ফিলিস্তিনে চলমান গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে তথাকথিত খলিফা পশ্চিমাবিশ্বের মতই নিশ্চুপ। পত্র-পত্রিকায় এসেছে তালেবান, আল কায়েদার মত এদেরকেও নাকি তৈরি করেছে মার্কিনী ও ইহুদিবাদী শক্তি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের অজুহাত তৈরি করে দেওয়া জন্য, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ন্যায়। ইতোমধ্যেই তারা মার্কিন বাহিনীকে ইরাক আক্রমণ করার অজুহাত তৈরি করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারা পাঁচ শতাধিক ইয়াজিদি নামক নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ হত্যা করেছে যারা ইরাকের সিনজার ও কুর্দিস্তান এলাকার বাসিন্দা, যাদেরকে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসাবে বিবেচনা কোরছে আইসিস। প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়া প্রায় ৪০ হাজার ইয়াজিদি উত্তর ইরাকের সিনজার পর্বতে এখনও আটকা পড়ে আছেন। তাদেরকে উদ্ধারের অজুহাতে এবার যুক্তরাষ্ট্র বিমানে তাদের উপর বোমা হামলা শুরু করেছে, অবরুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য তারা বিমান থেকে ত্রাণসামগ্রী ফেলছে। এভাবেই মার্কিনীরা বরাবর মানবিক কার্যক্রম পরিচালনার নামে মোসলেম দেশগুলিতে প্রবেশ করে থাকে। এবার কিন্তু ষড়যন্ত্র পরিষ্কার। এখন তো সাদ্দামের স্বৈরাচারী সরকার নেই যে তাকে উৎখাত কোরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে বা কথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। এবার তারা এসেছে সিরিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য। প্রেসিডেন্ট ওবামা বলেছেন, 'আমরা সুন্নি জিহাদিদেরকে ইরাক ও সিরিয়ার ভূখণ্ড নিয়ে একটি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে দেব না। ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীর জঙ্গিদের অগ্রাভিযান ঠেকানোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থ নিহিত রয়েছে।' সেই কৌশলগত স্বার্থ হলো সিরিয়া বিজয় এবং এরপরের টার্গেট স্বভাবতই ইরান।

এই যে তারা ক্রমাগত আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে, এজন্য তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সনাতন যুদ্ধনীতি। কিন্তু দুঃখ লাগে মোসলেম নামক জাতিটির অবস্থা দেখলে। আল্লাহর শেষ রসুল সারা জীবন পরিশ্রম করে চরম বিশৃঙ্খল, পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত অসভ্য আরবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে এমন একটি অপরাজেয়, ইস্পাতের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করেছিলেন যাদের সামনে তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল তদানীন্তন বিশ্বশক্তি রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য! সেই বিজয় ধরে রাখা গেল না, কারণ একশ বছর না যেতেই আরবদের মধ্যে সেই চিরাচরিত গোত্রীয় জাহেলিয়াত এবং বিরাট সম্পদের অধিকারী হয়ে ভোগ-বিলাসের মানসিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করে শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব কোরতে লাগলো। নিজেদের মধ্যে মতভেদ করে শিয়া, সুন্নি, হানাফী, হাম্বলী, মালেকী, শাফেয়ী ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আজ আবার ভৌগোলিক জাতীয়তার ভিত্তিতে তারা কেউ ইরাকি, কেউ ইরানি, কেউ কুর্দি, কেউ বাংলাদেশি, কেউ সুদানি, কেউ ফিলিস্তিনি। এই সহস্রপ্রকার বিভক্তির ফলেই আজ এই জাতি আল্লাহর গজবের শিকার হয়ে অপমান, লাঞ্ছনার মৃত্যু বরণ কোরছে।

আমাদের কথা হোচ্ছে এই ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যতই বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধন, নিন্দা প্রকাশ করা হোক কোন সমাধান আসবে না। স্থায়ী সমাধান পেতে হলে বর্তমানের মোসলেম নামক এই শতধা বিচ্ছিন্ন, দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত, বিশৃঙ্খল এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সেই চিরন্তন শাশ্বত সত্য অর্থাৎ 'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন হুকুমদাতা নেই' এই কথার উপর। এটা ছাড়া আর বাঁচার কোন পথ নেই। আমাদের এবারের এই সংকলনটি পাঠক আদ্যপান্ত মনোযোগ দিয়ে পড়লে আশা করা যায় তিনি একটি সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবেন।

সূচিপত্র

- ইসরাইলি আগ্রাসন ও আরবদের চরিত্র-২
- পৃথিবীর বুকে দু'টি জমজমাট ব্যবসা 'ধর্মব্যবসা ও অস্ত্রব্যবসা'-৫
- জঙ্গিবাদ! গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার নির্বোধ মোসলেম জাতি-৭
- ঐক্যসূত্রের খোঁজে: মানবজাতির কমন ইন্টারেস্ট- "শান্তি" -১০
- আজ সর্বত্র কলেমার ভুল অর্থ প্রয়োগ করা হয়-১৩
- সনাতন ধর্মেই হোক মানবজাতির মেলবন্ধন-১৬
- জান্নাতি ফেরকার প্রধান কাজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা-১৮
- আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম ও বর্তমান বিকৃত এসলামের মধ্যে পার্থক্য-২০
- একচোখা দাজ্জালের পায়ে সাজদাবনত মানবজাতি-২৪
- সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় এবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান করা- ২৭
- আজকের ইহুদিবাদী ইসরাইল কোথা থেকে এলো-২৯
- স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র-৩১

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: শাহান পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : অ্যাডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpatro14@gmail.com

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ইসরাইলি আগ্রাসন ও আরবদের চরিত্র

অসহায় ফিলিস্তিনিদের উপর ক্রমাগত নির্দয়-নির্মম ও হৃদয়বিদারি আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধকে হত্যা কোরছে ইসরাইলি বাহিনী। পশ্চিমা মদদপুষ্ট এই দেশটিকে হত্যালীলা থেকে বিরত করা যেন দুঃসাধ্য হোয়ে পড়েছে। এটা স্পষ্ট যে, এই আগ্রাসন ও বিশ্বজনমতের প্রতি এত বড় ধৃষ্টতার ক্ষমতা ইসরাইলের নিজের নয়। এটা কেবল সম্ভব হোচ্ছে কথিত বিশ্ব মানবতার ফেরিওয়ালা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ গুটিকতক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আস্কারায়। এ এক নির্মম সত্য, যা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু এখানে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা থেকে যায়, যে কথাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে মোসলেম দেশগুলোতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির পেছনে সাধারণত একচেটিয়াভাবে পশ্চিমা মোড়ল ও তাদের মদদপুষ্ট ইসরাইলকে দায়ী করা হোলেও, বাস্তবে এ দায় মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর উপরই বেশি বর্তায়। কীভাবে- তা ব্যাখ্যা কোরছি।

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল নামের রাষ্ট্রটি প্রবল ইহুদি জাতীয়তাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমা লবি ছাড়াও তাই ইসরাইলের অন্যতম একটি শক্তি হোলো ঐক্য। প্রবল জাতীয়তার টানে সারা পৃথিবী থেকে দলে দলে ইহুদিরা এসে ইসরাইলে একত্রিত হোয়েছে, আজও হোচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। পুরো ফিলিস্তিন ভূখণ্ড তাদের প্রয়োজন। পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে তারা তাদের সামনে নতমস্তকে দেখতে চায়। এ লক্ষ্য নিয়েই তারা এগোচ্ছে, আর এ লক্ষ্যমাত্রা তাদের অনেকাংশেই অর্জিত হোয়ে গেছে; অন্তত যতটা অর্জন হোলে পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গরু বানিয়ে হালচাষ করানো যায় ততটুকু হোয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হোল মাত্র এক কোটিরও কম জনসংখ্যার এই জাতিটি যখন পুরো মধ্যপ্রাচ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, একের পর এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি কোরছে তখন মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশগুলো কী কোরছে? এতবড় অন্যায়কে তারা কেন মুখ বুঁজে সহ্য কোরছে?

অধিকাংশ আরবরা নিজেদের মোসলেম বলে দাবি করে। মধ্যপ্রাচ্যে বেশ কিছু আরব দেশ আছে যে দেশে শতকরা একশ' জনই মোসলেম। এই দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ, সরকার, সেনাপ্রধান, বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞ থেকে আপামর জনতা, সবার দাবি তারা মোসলেম। এদের অনেকেই আছেন যারা নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কাল দাগ ফেলে দিয়েছেন, এদের মধ্যে অনেক বড় বড় পীরের মুরিদ আছেন, হাতেম তায়ী বা দাতা কর্ণ আছেন অর্থাৎ তাদের এবাদত, উপাসনা, ধর্মীয় উৎসব, অনুষ্ঠানাদির কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হোল- নামাজ-রোজা ইত্যাদি বিষয়ে এরা যথেষ্ট সচেতন হোলেও ঐক্যের ব্যাপারে এ জাতি আল্লাহর হুকুম থেকে আজ যোজন যোজন দূরে অবস্থিত। তাদের ঐক্যের ভিত্তি ধর্মীয় আদর্শ নয়, ভৌগোলিক জাতীয় স্বার্থ। আর এখানেই তাদের ধর্মের জিগির মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। প্রমাণিত হয় যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো ধর্মের ছদ্মবেশে থেকে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা। এটা কোরতে গিয়ে কার স্বার্থে আঘাত লাগলো, কে মোরল কে বাঁচলো, কে মোসলেম কে অমোসলেম, যালেম নাকি মজলুম তা থাকে বিবেচনার বাইরে।

এক মাসেরও বেশি সময় ধোরে ফিলিস্তিনে বর্বরোচিত ইসরাইলি আগ্রাসন চোলছে। বেড়েই চোলেছে লাশের সারি। এ সারিতে পিছিয়ে নেই নারী-শিশু বা বৃদ্ধরাও। মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি নামক নাটক মঞ্চস্থ হোচ্ছে ইসরাইলের সৈন্যদের বিশ্রাম নেওয়ার নিমিত্তে এবং বিশ্ববাসীর দৃষ্টিকে প্রতারণা করার চক্রান্ত নিয়ে। অতঃপর সেটা ভাঙা হোচ্ছে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শন কোরে। এদিকে পশ্চিমা ভাবাদর্শের বৃহৎ মিডিয়াগুলো বেশ সুচারুভাবে ইসরাইলকে বাঁচিয়ে চোলেছে, আর সব অপরাধের দায় চাপাচ্ছে হামাসের ঘাড়ে। এটা আজকে নতুন নয়, মোসলেমদের ব্যাপারে পশ্চিমা

মিডিয়ার এটা জাতীয় চরিত্র। ওদিকে জাতিসংঘের মানবতা, মানবাধিকার আর আইন-আদালতের দরজা রোয়েছে বন্ধ। আর যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ পশ্চিমা বিশ্বের চোখে ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার ছাড়া আর যেন কিছুই দৃষ্টিগোচর হোচ্ছে না। ফিলিস্তিনের সাধারণ বেসামরিক মানুষের আর্তনাদ তাদের কানে যাচ্ছে না। নীরব-নিথর, বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও মৃতপ্রায় শিশুর বীভৎস দেহের ছবি তারা দেখতে পাচ্ছে না। ইসরাইলের আত্মরক্ষার জন্য হাজার হাজার ফিলিস্তিনির মৃত্যু তাদের চোখে সন্ত্রাসী নয়, কিন্তু ঐ আত্মরক্ষার জন্যই হামাস যখন অকার্যকর কিছু সেকেলে রকেট নিক্ষেপ কোরছে তখন তা বিবেচ্য হোচ্ছে সাংঘাতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে। আজ ফিলিস্তিনিদের সামনে পেছনে, ডানে-বামে সবদিকে অবরোধ। নেই পালাবার কোনো দরজা। কেবল মৃত্যুর দরজাই তাদের সামনে খোলা রোয়েছে। আর সেটাই বরণ কোরতে বাধ্য কোরছে ইসরাইলি বর্বর বাহিনী। সব মিলিয়ে অসহায় মোসলেম ফিলিস্তিনির পাশে এখন কেউ নেই। ওআইসি, আরবলীগ ইত্যাদি নামক উটপাখির জোটগুলো মরুভূমির বালির মধ্যে মুখ গুঁজে বোসে আছে। অথচ সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য যদি আজ ঐক্যবদ্ধ থাকতো, মোসলেমদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য-সংহতির কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকতো তাহোলে আজকের চিত্র পাল্টে যেতে সময় লাগতো না। মধ্যপ্রাচ্যের আরব মোসলেম দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ একটি হুংকারই যথেষ্ট ছিল ইহুদি রাষ্ট্রটিকে সব ধরনের অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য। ঠিক আজকের দিনটি পর্যন্ত এই আরব দেশগুলো যে শক্তি-সামর্থ্য অর্জন কোরেছে, সেটা ঐ ক্ষুদ্র ইহুদি জাতির তুলনায় বহু বহুগুণ বেশি। কী নেই তাদের! যদি মধ্যপ্রাচ্যের কথিত মোসলেম নেতৃত্ব তাদের ব্যক্তিস্বার্থের জন্য পশ্চিমাদের কাছে মাথা বিক্রি না কোরত তাহোলে জনবল, সামরিক বল, সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান সব দিক দিয়ে এ জাতির ঐক্যের কাছে ইসরাইল পরাজয় বরণ কোরতে বাধ্য হোত। ইসরাইলের জনসংখ্যা যেখানে একাত্তর লক্ষ, সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের মোসলেম দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা হলো প্রায় ৪৩ কোটি। আর এর মধ্যে যুদ্ধক্ষমই আছে ১৮ কোটির বেশি মোসলেম। সামরিক বাজেটে ইসরাইল যখন খরচ করে মাত্র ১২ বিলিয়ন তখন শুধুমাত্র সৌদি আরবই খরচ করে ৫৫ বিলিয়ন। মধ্যপ্রাচ্যের মোসলেম দেশগুলোর সামরিক বাজেটকে একত্রিত করা হোলে যা দাঁড়ায় তা ইসরাইলের খরচের ১৭ গুণ। সামরিকভাবে নয়, আরবের মোসলেম দেশগুলো চাইলে যুদ্ধ ছাড়াও শুধুমাত্র অবরোধের মাধ্যমেই ইসরাইলকে প্রতিরোধ কোরতে পারে। সাগর, আকাশ, ভূমি এই তিন পথের প্রত্যেকটির জন্যই ইসরাইল আরবের মোসলেম দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল। আরব দেশগুলো এই পথ খুব সহজেই ইসরাইলের উপর অবরোধ আরোপ কোরে বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু সেটা কোনোদিনও সত্য হবার নয়। যা হবার তা ইতোমধ্যেই হোয়ে গেছে। ফিলিস্তিনি মোসলেমদের দুঃখ, কষ্ট, আহাজারি বোঝার জন্য যে হৃদয়, চেতনা সর্বোপরি মস্তিষ্ক দরকার সেটা আরব নেতৃত্বের মধ্যে অনুপস্থিত। ভোগ-বিলাসিতা আর ক্ষমতার মোহে কখন যে তারা নিজেদের মাথা পশ্চিমাদের কাছে বিক্রি কোরে দিয়েছে তা তাদেরও অজানা। আর তাই যতই সুযোগ বা সামর্থ্য থাকুক না কেন আরবরা নিপীড়িত ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়াবে না। বরং পারলে অতীতের মতো এখনও এই জাতির সাথে গাদ্দারী কোরে অবৈধ আগ্রাসীদেরই রসদ যোগাবে। এদের এখন না আছে নৈতিকতা, না আছে ন্যায়ের প্রতি এতটুকু সম্মানবোধ। এরা মোসলেম নয়, এদের কোনো ধর্ম নেই। সিংহাসন, অর্থ-সম্পদ, আর ভোগ-বিলাসিতাই এদের একমাত্র ধর্ম। আর সে ধর্ম পালন কোরতে গিয়ে তারা যে কতটা নীচে নেমে গেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সমগ্র মোসলেম জাতি যখন দারিদ্র্যের কবলে আক্রান্ত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হোচ্ছে, তখন এদের ভোগ-বিলাসিতার নজির দেখলে নিশ্চিতভাবেই যে কারও তাদের প্রতি ধিক্কার জন্মাবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই আরবরা ছিল অতি গরীব। মাটির নিচ থেকে তেল বের হওয়ার পর থেকে হঠাৎ ধন দৌলত ও সম্পদে পৃথিবীর অন্যতম ধনী জাতিতে পরিণত হোয়েছে। এখন এদের সম্পদ রাখবার জায়গা নেই। এই সম্পদ তারা কিভাবে ব্যবহার কোরছে? এরা একটা অংশ এর ব্যয় কোরছে পাশ্চাত্যের অনুকরণ কোরে দেশের রাস্তাঘাট, পুল, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিরাট বিরাট প্রাসাদ, হোটেল, ফ্লাইওয়ে (Flyway) ইত্যাদি তৈরি কোরে। অঢেল টাকা ব্যয় কোরে এগুলো এমনভাবে তৈরি কোরছে যে, ইউরোপের, আমেরিকার মানুষরাও দেখে আশ্চর্য হোচ্ছে, হিংসা কোরছে। অগুনতি রাজকীয় প্রাসাদ, হোটেল, সমস্ত ইমারত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (Air Conditioned)। শাদ্দাদ আল্লাহর সঙ্গে নাকি পাল্লা দিয়ে জান্নাত বানিয়েছিলো। সে আজ কবর থেকে উঠে এসে এদের শহর, নগর, পথ-ঘাট, হোটেল আর প্রাসাদগুলি দেখলে বোলবে- আমি আর কি বানিয়েছিলাম। সম্পদের অন্যভাগ তারা ব্যয় কোরছে অবিশ্বাস্য বিলাসিতায়, স্থূল জীবন উপভোগে, ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে। দৈহিক ভোগে এরা কি পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করে তা আমাদের মত গরীব দেশগুলির মোসলেমরা ধারণাও কোরতে পারবে না, লক্ষ লক্ষ ডলার তাদের কাছে কিছু নয়। তাদের ঐ অঢেল সম্পদের একটা মোটা ভাগ চলে যায় ঐ ইউরোপ, আমেরিকায়, জাপান ইত্যাদি দেশের কাছে, বিলাসিতার সামগ্রীর দাম হিসাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী গাড়িগুলো কেনে এরাই। শুধু তাই নয়, রোলস, মার্সিডিস, আলফা-রোমিও, সিট্রন, ক্যাডিলাক ইত্যাদি গাড়ি শুধু কিনেই তারা খুশী নয়, এই গাড়িগুলির বাম্পার লাইনিং তারা খাঁটি সোনা দিয়ে মুড়ে দেয়। এদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ের কিছুমাত্র প্রভাবও থাকলে এরা এমন কদর্য বিলাসিতায় নিজেদের ডুবিয়ে দিতে পারতো না। নিজেদের অতি উৎকৃষ্ট মোসলেম বোলে মনে কোরলেও এবং তা প্রচার কোরলেও আসলে ইউরোপ, আমেরিকার

গাজায় বর্বরোচিত ইসরাইলি হামলায় গুরুতর আহত ফিলিস্তিনি শিশুটি যেন ধিক্কার দিচ্ছে কথিত এই সভ্যতাকে। শিশুটির সারা শরীর জুড়ে রয়েছে ইসরাইলি বোমার আঘাতের শত শত ক্ষত। কিন্তু এত আঘাতের পীড়া উপেক্ষা কোরে ডাক্তারের কাছে তার একটিই আর্তনাদ- 'আমি আমার বাবাকে চাই, আমার বাবাকে এনে দাও।'

ছবি- ডেইলি মিরর।

বস্তুতান্ত্রিকদের (Materialist) সাথে তাদের কার্যতঃ কোন তফাৎ নেই। বরং অনেক আগেই পশ্চিমা বস্তুবাদীদেরকে এরা ছাড়িয়ে গেছে। এদের পুরুষরা লম্বা জুব্বা, পাগড়ী, দাড়ি আর হাতে তসবীহ ধারণ কোরে এবং নারীদের আপাদমস্তক কালো বোরকায় আবৃত কোরে বোঝাচ্ছে যে, এরা পাক্কা মোসলেম। আসলে এরা বহু আগেই আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ঘৃণিত চরিত্রে ফিরে গেছে। এদের দেখলে আবু লাহাব, ওতবা, শায়বারাও লজ্জায় মুখ লুকাবে। তারা বোলবে- আমরা সরাসরি মোহাম্মদ (দঃ) এর বিরোধিতা কোরেছি কিন্তু তার বেশ-ভূষা ধারণ করে মোসলেম দাবি করে এভাবে ভণ্ডামি করি নি।

এরা এই উম্মাহর কেন্দ্র কাবা এবং নেতার (দঃ) রওযা মোবারকের হেফাযতকারী হোলেও এই উম্মাহর জন্য তাদের মনে কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই। তার প্রমাণ হোচ্ছে এই যে, নিজেদের ঘৃণ্য বিলাসিতার সামগ্রী কিনতে তাদের বিপুল সম্পদ চোলে যায় ইউরোপ, আমেরিকা আর জাপানে। তারপরও যে বিরাট সম্পদ তাদের থেকে যায় তা বিনিয়োগ করেন সেই ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, শিল্পে। টাকা জমা রাখেন ঐসব দেশের ব্যাংকেই যা থেকে লাভবান হয় ঐসব অমোসলেম দেশ ও জাতিগুলিই। এসলাম ও মোসলেম জাতির প্রতি তাদের কিছুমাত্র ভালোবাসা যদি থাকতো তবে ঐ বিরাট সম্পদ তারা অমোসলেম দেশগুলিতে বিনিয়োগ না কোরে গরীব মোসলেম ভৌগোলিক রাষ্ট্রগুলিতে বিনিয়োগ কোরতেন। এতে অন্ততঃ পার্থিব দিক দিয়ে এই হতভাগ্য জাতির কিছু অংশ উপকৃত হোতে পারতো। অন্যান্য অতি দরিদ্র মোসলেম দেশগুলির জন্য তারা কিছু কিছু মাঝে মাঝে খয়রাত করেন যখন কোন দেশে বন্যা, ঝড় বা প্লাবনের মত প্রাকৃতিক কারণে মহাক্ষতি হয়। এইসব দেশগুলির মানুষকে তারা ডাকেন মিসকীন বোলে। যে ঐক্য ছাড়া শক্তি নেই, জাতির সেই ঐক্য সুদৃঢ় রাখার জন্য রসুলাল্লাহ (দঃ) তাঁর জীবনের শেষ জনসমাবেশ বিদায় হজ্বে বোলে গেলেন আরবের মানুষের উপর অ-আরব মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যেমন নেই অ-আরব মানুষের উপর আরবের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ সবাই সমান। মানুষে মানুষে প্রভেদের একটিমাত্র সংজ্ঞা দিয়ে গেলেন, কে কত ভাল মোসলেম। ঐ 'উৎকৃষ্ট মোসলেমদের' আজ মহানবীর (দঃ) ওসব কথা কিছুই মনে নেই। থাকলেও ওসব কথার কোন গুরুত্ব তারা দেয় না। তারা আরব, সবার শ্রেষ্ঠ, এই অহংকারে স্ফীত হোয়ে অন্যকে অনুকম্পার পাত্র মনে কোরছে।

এই আরব দেশ ও আমীরাতগুলির বাদশাহ ও আমীরদের এলাহ হলো তাদের যার যার সিংহাসন ও আমীরত্ব। এই সিংহাসন ও আমীরত্বের নিরাপত্তার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের ও ইউরোপের কথায় ও আদেশে উঠেন বসেন, অন্য মোসলেম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। মুখে ইসরাইলের বিরুদ্ধে লোক দেখানো চিৎকার কোরলেও কার্যতঃ ইসরাইলের ক্ষতি হবে এমন কোন কাজ করেন না, ঐক্যবদ্ধ হোয়ে ইসরাইলকে ধ্বংস করেন না, কারণ তা কোরতে গেলে প্রভু যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ বিরক্ত হবে এবং তাতে তাদের সিংহাসন ও আমীরত্ব হারাতে হোতে পারে। যদি এমন কোন পরিস্থিতি কখনও হয় যে তাদের সিংহাসন বা আমীরত্ব রক্ষা এবং কাবা ধ্বংস করা এ দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারা কাবা ধ্বংসকেই বেছে নেবেন।

পৃথিবীর বুকে দু'টি জমজমাট ব্যবসা

'ধর্মব্যবসা ও অস্ত্রব্যবসা'

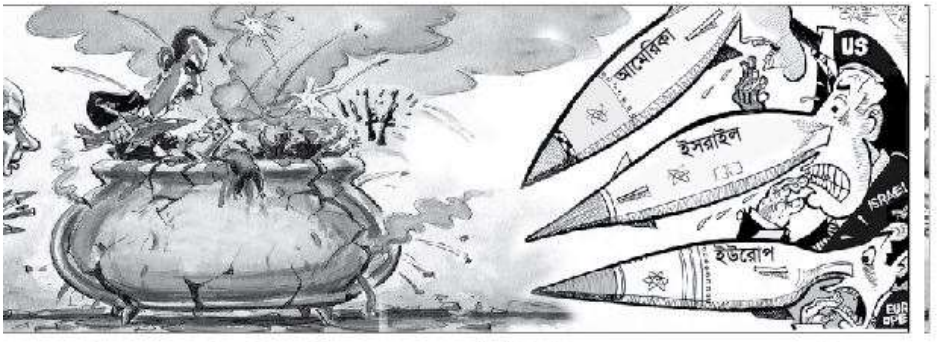

যুদ্ধ-সংঘাতই অস্ত্রের প্রকট চাহিদা সৃষ্টি কোরে অস্ত্রব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের লাভবান করে, আর অন্যদিকে ফতুর হয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠী। অস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রধান সম্বল হলো যুদ্ধ, অস্ত্র নয়। অস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি করার জন্য এহেন কাজ নেই, যা তারা কোরতে পারে না। বিশ্বের বড় বড় যুদ্ধবাজ দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে এরাই। তাই যখনই অস্ত্রের চাহিদা কমে যায়, অস্ত্র বিক্রি করার মতো কোনো উপায় থাকে না, তখনই মিথ্যা অজুহাতে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধ-সংঘাত, এক পক্ষের ভয় দেখিয়ে আরেক পক্ষের কাছে চড়া মূল্যে বিক্রি করা হয় অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভার। বিশ্বের বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোর অস্ত্রব্যবসায়ীরা ও তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিকরা এভাবেই পৃথিবীর কোটি কোটি নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে খেলছে, প্রতারণা চালিয়ে

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বর্তমান বস্তুবাদী পশ্চিমা 'সভ্যতা' নিয়ন্ত্রিত পৃথিবীতে জমজমাট কয়েকটি ব্যবসার তালিকা কোরলে সর্বাগ্রে স্থান পাবে ধর্মব্যবসা ও অস্ত্রব্যবসা। মরমা এ ব্যবসা দু'টির ফাঁদ থেকে যেন কারও পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই রোয়েছে পুরোহিত-যাজক শ্রেণি যারা অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন কোরে থাকে। কেউবা রাজনীতির অঙ্গনে ধর্মকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে। এগুলো সবই ধর্মব্যবসা। অন্যদিকে অস্ত্রব্যবসার সরল-গাণিক অর্থ ছাড়াও আরও একটি ব্যবহারিক অর্থ আছে। সেটা হোল আগে সুপরিকল্পিতভাবে অস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি করা, অতঃপর অস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রি করা। বিশ্বব্যাপী চলমান অস্ত্রব্যবসার মহাজন হোচ্ছে বিশ্বমোড়ল যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি পরাশক্তিধর দেশগুলি। আর খাতকের জায়গায় আছে উন্নয়নশীল, অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলো। অবশ্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোও এ ব্যবসার দ্বারা কম নিপীড়িত হোচ্ছে না। তারাও বিশ্ব অস্ত্রশক্তির তালিকায় এবং সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান ধোরে রাখার জন্য কোটি কোটি ডলারের অস্ত্র মজুদ কোরতে গিয়ে ফতুর হোচ্ছে।

প্রথমেই আসি ধর্মব্যবসা প্রসঙ্গে। ধর্মকে পার্থিব স্বার্থে ব্যবহার করা একটি সুস্পষ্ট প্রতারণা। এ প্রতারণার করালগ্রাস থেকে মুক্ত নয় কোনো ধর্মের মানুষ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এসলাম ইত্যাদি পৃথিবীতে আজ যত ধর্ম প্রচলিত আছে তার সবই এখন ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে কুক্ষিগত। কেউ ধর্মের লেবাস পরে ধর্মগ্রন্থাদির মুখস্থ বিদ্যা আউড়িয়ে অর্থ উপার্জন কোরছে, আবার কেউ ধর্মকে বানাচ্ছে রাজনীতির হাতিয়ার। এ সবগুলোই ধর্মব্যবসা, যার নিষেধাজ্ঞা প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই মিলে। কিন্তু সে ধর্মগ্রন্থগুলোও তো ঐ ধর্মব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাতে বন্দী। কাজেই ধর্মব্যবসায়ীদের নিকৃষ্ট এই কর্ম সম্পর্কে আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ ধর্মভীরু ব্যক্তিই অনবহিত। তারা ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা-পুরুত ও ধর্মীয় বুলি কপচানো রাজনীতিকদেরকে ধর্মের অভিভাবক ভেবে কার্যত প্রতারণার পালে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে। আর সে হাওয়ায় ফুলে ফেঁপে উঠছে ধর্মব্যবসায়ী প্রতারকরা। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দেশে ধর্মব্যবসায়ীদের জ্বালানো আগুনে দগ্ধ হোচ্ছে অসংখ্য নিপীড়িত অসহায় আদম সন্তান। বিশেষ কোরে মোসলেম দেশগুলোতে এর ভয়াবহতা সীমা অতিক্রম কোরেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হোল এদের অপকর্ম দ্বারা সাধারণ মানুষ যতই নিপীড়িত হোক না কেন, প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী মহাজনরা কিন্তু স্বল্প দিনের ব্যবসাতেই নাম কামিয়ে ফেলেন। তারা সমাজে পরিচিত হন মাওলানা, আলেম, ওলামা, মোফাসসের, পীর, কামেল, ওলি ইত্যাদি হিসেবে। এভাবে যুগ যুগ ধরে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা অব্যাহত থাকার পরিণাম এই হোয়েছে যে, মানবতার মুক্তির পথ ধর্ম রূপ লাভ কোরেছে মোল্লাতন্ত্রে। সমাজে একটি যুবক

আজ যতটা না তার পিতাকে সম্মান করে তার চেয়ে বেশি সম্মান করে কথিত মাওলানা সাহেবকে। স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য না কোরলেও পীর সাহেবের আনুগত্য করেন। পিতা তার সন্তানকে অর্ধভুক্ত রেখে সারা দিনের উপার্জনের টাকা মাজারের দানবাক্সে ফেলে আসে। দরজায় বুভুক্ষ-হাড্ডিসার ভিক্ষুককে দাঁড় করিয়ে রেখে দোয়া ও পুণ্যের আশায় মোল্লা সাহেবকে গোস্ত পোলাও খাওয়ায়।

একই অবস্থা অস্ত্রব্যবসায়েরও। অস্ত্রব্যবসা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচলিত। জমজমাট এই ব্যবসাটিও ধর্মব্যবসার মতোই সিন্ডিকেট নির্ভর। আর এ ব্যবসায় গুটিকতক পুঁজিপতি ব্যবসায়ীর ষড়যন্ত্রের বলি হয় পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি। বর্তমান পৃথিবীতে মূলত অস্ত্রব্যবসার গুটি নাড়ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন, জাপান, ফ্রান্স ইত্যাদি শক্তিধর দেশগুলো। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তথা প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের আমলে অস্ত্র বিক্রির জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে মোটামুটি কিছু অজুহাত ছিল। কিন্তু রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকার অস্ত্রব্যবসা পড়ে বেকায়দায়। পরবর্তীতে বুশ (সিনিয়র) সে বেকায়দা থেকে আমেরিকার অস্ত্রব্যবসাকে রক্ষা করে ইরাক আক্রমণের মাধ্যমে। কিন্তু এরপর ক্লিন্টনের আমলে তারা আবার বিপদে পড়ে। অস্ত্রব্যবসায় ভাটা পড়ে যায়। কারণ ক্লিন্টন যুক্তরাষ্ট্রের চিরাচরিত আগ্রাসী চরিত্রের সাথে মানানসই ছিলেন না। তিনি বহির্বিশ্ব নিয়ে ততটা মাথা ঘামাতেন না। বেশি মনোযোগ দিতেন নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের দিকে। এতে কোরে যুক্তরাষ্ট্র বেকারত্ব রোধে কিছুটা সফল হতে পারলেও অস্ত্রব্যবসায়ের মত বড় একটি আর্থিক খাতে সৃষ্টি হয় খরা। তাছাড়া সে সময় বিশ্ব মোড়লীপনাও খানিকটা খর্ব হয় যুক্তরাষ্ট্রের। অতঃপর জর্জ বুশ (জুনিয়র) আসার পর তাদের অস্ত্রব্যবসায় প্রাণ সঞ্চার হয়। একটি ভালো মানের অজুহাতও সৃষ্টি করা হয়। সেটা হোল- টুইন টাওয়ার ধ্বংস। এখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রব্যবসার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যপটে গণতন্ত্রের বিপরীতে কম্যুনিজমের যে স্থান ছিল সেটা দখল করে এসলাম বা এসলামী সন্ত্রাস। শুরু হয় আফগান, ইরাক ইত্যাদি স্থানে একের পর এক আক্রমণ। কিছুদিনের মধ্যেই চারিদিকে অস্ত্রের চাহিদা সৃষ্টি হোতে থাকে। আর অস্ত্র বিক্রি কোরে লাভবান হয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় আছে, যে কারণে কিছুটা লাভবান হোলেও তাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসছিল না। সমস্যা দাঁড়িয়েছিল এই যে, যখন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বিভিন্ন দেশ আক্রমণ কোরছে তখন তো তার মিত্র দেশগুলোর অস্ত্র কেনার দরকার পড়বে না। তাই এবারে পলিসিতে কিছুটা রদ-বদল আনা হোল। এবারে টার্গেট করা হোল ইরান, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশের প্রতি। সারা পৃথিবী থেকে বেছে বেছে এরকম কয়েকটি দেশকে নিয়ে শুরু হোল হুলুস্থুল। উপলক্ষ হিসেবে নেয়া হোল এ দেশগুলোর পরমাণু কর্মসূচি। ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল পৃথিবীজুড়ে। তখন ইরানকে জুজু বানিয়ে তার ভয় দেখিয়ে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ইরানবিরোধী দেশগুলোতে অস্ত্রবিক্রি করা শুরু হোল। আবার উত্তর কোরিয়ার ভয় দেখিয়ে অস্ত্র বিক্রি করা হোল দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের কাছে। আরব দেশগুলোর আছে পেট্রো ডলার, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের আছে বিশাল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের অর্থ। চীনের সাথে তাইওয়ানকে নিয়েও বেশ খেলা শুরু হোল। আর এভাবে কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই শুধু প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের বাজার চাঙ্গা হোয়ে গেল।

এরপর ২০১২ সালে এসে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন খেলা শুরু হয়। এখানেও মার্কিন অস্ত্রব্যবসায়ীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার কোরেছে। তিউনিসিয়া, মিসর, সিরিয়া, ইয়েমেন ও লিবিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনকে সব সময়ই মদদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্র দেশগুলো। গত বছরের শেষ দিকে যখন মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের আন্দোলনে টালমাটাল অবস্থা তখন সুযোগ বুঝে পশ্চিমারা ওই সব দেশে হাজার হাজার কোটি ডলারের অস্ত্রব্যবসায় ব্যস্ত হোয়ে পড়ে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বোলছে, মিসর, সিরিয়া, লিবিয়া, বাহরাইন ও ইয়েমেন-এই ৫টি দেশে গত ৫ বছরে ২০০ কোটি ৪০ লাখ ডলারের অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি কোরেছে পশ্চিমারা। এসব অস্ত্র মানবাধিকার লঙ্ঘন কোরতে পারে জেনেও বিক্রি অব্যাহত রাখে তারা।

শুধু যে যুক্তরাষ্ট্রই এ খেলা চালাচ্ছে তা কিন্তু নয়। এ খেলার অপরদিকে আরেকটি পক্ষ রোয়েছে যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশ। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়াসহ শক্তিধর দেশগুলোর রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হোচ্ছে পুঁজিপতি অস্ত্রব্যবসায়ীদের দ্বারা। প্রকৃত লাভবানও হোচ্ছে তারাই। আর এ অস্ত্রবাণিজ্যের বিপুল অর্থ যোগান দিতে হোচ্ছে বিভিন্ন অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনসংখ্যাকে। বিভিন্ন দরিদ্র রাষ্ট্রের সরকারগুলো অস্ত্রব্যবসায়ীদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ খরচ কোরে অস্ত্র কিনছে সে অর্থ দিয়ে খুব সহজেই সে দেশের দারিদ্র্য লাঘব করা যায়।

ধর্মব্যবসা ও অস্ত্রব্যবসার মধ্যে গভীর সম্পর্কও রয়েছে কারণ পৃথিবীর প্রায় সকল যুদ্ধের পেছনেই থাকে ধর্ম। তাই কোন একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আরেকটি সম্প্রদায়কে কোনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারলেই খুলে যায় অস্ত্রব্যবসার দ্বার। কৈ এর তেলেই ভাজা হয় কৈ। সুন্নির হাতে শিয়া মরে, শিয়ার হাতে সুন্নি। যুক্তরাজ্য 'বৈধভাবে' সিরিয়ার বিদ্রোহীদের কাছে বিক্রি করে রাসায়নিক অস্ত্র। সাধারণ মানুষের কাছে এসব তথ্য অজানাই থেকে যায়, তারা কেবলই হয় দুর্ভোগের শিকার। তারা নিজেরাও জানে না যে, ধর্মব্যবসায়ীরা কীভাবে কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাসকে ব্যবহার কোরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কোরছে। তারা জানে না কীভাবে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ তাদের অজান্তেই পশ্চিমা শোষককুলের ব্যাংকে জমা হোচ্ছে আর বিনিময়ে তাদেরকে যুগের পর যুগ দারিদ্র্যের ঘানি টানতে হোচ্ছে।

ইলিয়াস আহমেদ

জঙ্গিবাদ! গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার নির্বোধ মোসলেম জাতি

অস্ত্র কেন রাখা হয়? চোর ডাকাত ধরার জন্য? নাকি সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস করার জন্য? জানি প্রশ্নটা অসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এর উত্তর কেবল শর্তানুসারেই দেয়া সম্ভব। যেমন চোর ডাকাতকে ধরতে নিশ্চয় ড্রোন বিমান, মিসাইল, রাসায়নিক অস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র লাগে না। তাহোলে এসব রাখা হয় কেন? যাদের কাছে এসব অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রগুলো আছে, তারা এক কথায় উত্তর দেবে সন্ত্রাসবাদ ধ্বংস করে পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্য। এই প্রশ্নের এ ধরনের উত্তর শুনেই আমরা অভ্যস্ত।

শান্তিকামী মানবতাবাদীদের মন ভোলানো কথা শোনার আগে পরিসংখ্যান দেখে নিই, কারা এই অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের স্রষ্টা ও সরবরাহকর্তা। বিশ্ব অস্ত্রবাণিজ্যে ৩০ শতাংশ অংশিদারত্ব নিয়ে প্রথম অবস্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২৬ শতাংশ অংশিদারত্ব নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে রাশিয়া। এ তালিকায় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে আছে যথাক্রমে জার্মানি, ফ্রান্স ও চীন। [www.theholytimes.com/front/viewnews/1061]

অস্ত্রবাণিজ্য শব্দটা যখন এসে গেছে তখন এর প্রায়োগিক ক্ষেত্রের প্রসঙ্গটা এড়ানোর সুযোগ নেই। প্রশ্ন না করতেই প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আমরা যে উত্তর পাবো তা হলো- সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তিরক্ষীবাহিনী, বিশেষ সৈন্যবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ দমন, গৃহযুদ্ধের অবসান ইত্যাদি।

এটা কাউকে বলে দিতে হবে না যে, যতো রকম জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ ইস্যু আছে তা সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে। মধ্যপ্রাচ্যের নাম শুনলেই সারা পৃথিবীর চোখের সামনে ভেসে আসে জঙ্গি সংগঠনগুলোর জঙ্গিবাদের চিত্র। কানে ভেসে আসে জেহাদ নামের বিষাক্ত একটা উচ্চারণ। আর মুখ ভরে থুথু আসে ঐ জেহাদী কট্টরপন্থী মোসলেমদের হাতে অস্ত্র দেখে। শান্তিপ্রিয় মোসলেমরা কানে আঙ্গুল গুঁজে বলে এসলাম শান্তির ধর্ম। কারো যেন কোনো দায় নেই; সব দায় বুঝি ঐ জঙ্গিদের, মোসলেম জাতিটির!

অথচ যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গিবাদ দমন করার নামে অথবা পারমাণবিক অস্ত্র রাখার সন্দেহবশত অথবা সরকারপক্ষের সাথে বিরোধীপক্ষের গৃহযুদ্ধ থামানোর কথা বলে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়। কিন্তু দেখা যাবে তাদের চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্রের ফলেই মোসলেম দেশে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি। জঙ্গিবাদ দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের বাড়িঘর উড়িয়ে দিয়ে কবরস্থানে পরিণত করে। বাদ যায় না নারী, শিশু। ধর্ষণের চিত্র মিডিয়ায় আসে না। শিরোনামে ভাসে শুধু 'জঙ্গিবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্রের সফল অভিযান!' আর জাতিসংঘ মুচকি হাসিতে সাফল্যের পোজ দেয়।

এতো বড় অন্যায়ের ক্ষীণকণ্ঠে সামান্য প্রতিবাদ আসলেও প্রভুত্বের তাবেদারির বাতাসে তা মিশে যায়। বিশ্ববিবেক তখন যেন অট্টহাসি দিতেও ভয় পায়। ওদিকে নিঃস্ব-অসহায়-নির্যাতিত-গৃহহারা মোসলেম জাতিটি থেকে প্রতিবাদস্বরূপ জন্ম নেয়

এক একটা সশস্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। পরবর্তীতে যাদের নাম হয় তালেবান, আল কায়েদার মতো জঙ্গি দল। সম্প্রতি একটা ভাষণে হিলারি ক্লিনটন নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, "We created Al-Qayeda" [সূত্রঃ www.youtube.com/watch?v=Dqn0bm4E9yw]

আল কায়েদা যে যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা মদদপুষ্ট, এসম্পর্কে Michel Chossudovsky এর দেয়া সাক্ষাৎকারকে উড়িয়ে দেয়া যায়না। [সূত্রঃ www.globalresearch.ca]। ইরাকের ISIL জঙ্গি সংগঠন সম্পর্কে লেবাননের দৈনিক আদ দিয়ার পত্রিকাটি সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ কোরেছে। বলা হোয়েছে সংগঠনটির নেতা আবু বকর আল বাগদাদী ইহুদি পরিবারের সন্তান। তার প্রকৃত নাম শামউন ইয়লুত। এ তথ্যের সূত্র বেরিয়েছে আমেরিকার জাতীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা NSA'র সাবেক কর্মকর্তা এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা দলিল-দস্তাবেজ থেকে।

এর আগেও স্নোডেনের ফাঁস করা দলিল থেকে জানা গেছে, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ কথিত আবু বকর আল বাগদাদীকে এক বছর ধরে ধর্মীয় ও সামরিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং জেহাদ ও এসলামের নামে ইসরাইলের নিরাপত্তাবিরোধী বিশেষতই মোসলেম দেশগুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যই ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা MI-6, ইসরাইলের মোসাদ ও যুক্তরাষ্ট্রের NSA-এর তত্ত্বাবধানে জন্ম দেয়া হয়েছে ISIL-এর। অর্থাৎ ব্রিটেন -যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাঈলের ঔরসে জন্ম নিলো জঙ্গি সংগঠন ISIL.

এটার যে যথার্থই সত্যতা রোয়েছে, তার প্রমাণ মেলে আল-জাজিরা খবরে। সেখানে গত ২২.০৬.২০১৪ তারিখের টাইমলাইনে বলা হয় ISIL using US vehicles to fight Syria rivals. তার মানে যুক্তরাষ্ট্রের মদদে তাদের দেয়া অস্ত্রেই ইরাকসহ সিরিয়াতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে ISIL. অথচ এই সন্ত্রাসদের দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য যখন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র কিনতে চেয়েছিলো, যুক্তরাষ্ট্র নাকচ করে দিয়েছিলো। [সূত্রঃ আল জাজিরা, টাইমলাইনঃ ১২.০৬.২০১৪]

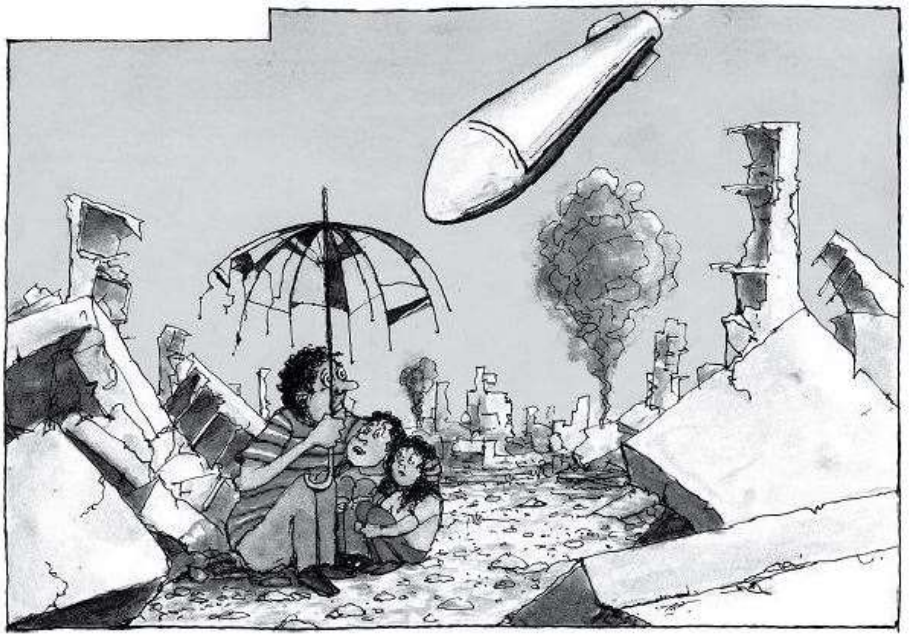

দেশে দেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো আগ্রাসন আজও বন্ধ হয় নি। আবারও ইরাকের আকাশে উড়ছে মার্কিন জঙ্গি বিমান। এবারের প্রতিপক্ষ তালেবান বা আল কায়েদা নয়, এবারের প্রতিপক্ষ ISIL যাদেরকে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত সিরিয়ার আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। এতদিন ধরে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করার পর এবার শুরু হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেই দমনাভিযান। কিন্তু এই দমনাভিযান কি সত্যকে আড়াল কোরতে পারবে? বস্তুত বিশ্ববাসী এটা ভালোভাবেই জানে এই জঙ্গিবাদ কাদের সৃষ্টি? এদেরকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে কারা লালন করে? এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদেরকে কারা টিস্যু পেপারের মতো ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করে?

যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে বিশ্ব বাজারে অত্যাধুনিক অস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যখনই কোনো বড় ধরনের ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করা হয়, তখন বিশ্বায়ন প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্বকে টিকে রাখা ও নিরাপত্তার তাগিদে ইরান, ভারত, পাকিস্তানের মতো দেশগুলোও পারমাণবিক ও অত্যাধুনিক অস্ত্র পুঁজিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অস্ত্রবাণিজ্যে ঠিক এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যায়। তবে অস্ত্র রপ্তানিতে যুক্তরাষ্ট্রই এগিয়ে। একটা কথা মনে রাখতে হবে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই অস্ত্রের চাহিদা বাড়বে। আর এ চাহিদার যোগান ঐ দেশগুলোই দিয়ে থাকে। অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি কোরতে হিরোশিমা, নাগাসাকি, ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, ভিয়েতনাম, গাজার মতো ভূখণ্ডকে ঝলসিয়ে দেয়া হয়। তালেবান, আইএসআইএল, আল কায়েদার মতো জঙ্গি সংগঠন তৈরি কোরে, তাদের হাতে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র দিয়ে মোসলেম দেশগুলোতে অরাজকতা, সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করা হয়। বাধ্য হোয়ে সে দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীনের কাছে অস্ত্র কিনতে আগ্রহী হয়। যেমন ISIL কে নির্মূল করতে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মালিকি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র কিনতে গিয়েছিলো।

এথেকে কি বোঝা যায় না, সন্ত্রাসবাদ দমন নয়, জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে অস্ত্রবাণিজ্য ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করাই যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য? যুক্তরাষ্ট্রই যে মানবতার বিপক্ষে তার প্রমাণ সম্প্রতি গাজা ইসরাইল যুদ্ধেই প্রমাণ মেলে। জাতিসংঘসহ সমগ্রবিশ্ব যখন গাজার পক্ষে তখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের কাছে সামরিক অস্ত্র বিক্রি কোরছে। [খবর মানবজমিন: ৩১.০৭.২০১৪]

আমরা যদি অতীতের দিকে লক্ষ্য কোরি, তাহোলে দেখা যাবে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্টে যথাক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা ফেলে। লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। প্রতিবন্ধীর সংখ্যাটা তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদ কিছুই ছিলো না। তাহোলে সেখানে কেন মারণাস্ত্রের আঘাত হানা হলো? ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা মনে আছে? ঐ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী অ্যাজেন্ট অরেঞ্জ ব্যবহার করে এক ভয়ংকর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো? নাম দিয়েছিলো 'অপারেশন রেঞ্চ হ্যান্ড।' এ যুদ্ধে ৪ লক্ষ মানুষ নিহত ও পঙ্গু হয় আর ৫ লক্ষ শিশু জন্ম নেয় প্রতিবন্ধী হয়ে। তখন কোথায় ছিলো তাদের মানবতা? কোথায় ছিলো জঙ্গিবাদ দমনের বুলি আওরানো? কোনো উত্তর দিতে পারবে কি? আসলে এরাই মানবতার মোড়কে জঙ্গিবাদ বিক্রি করে। এই জঙ্গি সংগঠনগুলোর সবাই যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইল ব্রিটেনের মদদপুষ্ট তা কিন্তু নয়। কিন্তু কথা হোচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তারাই জঙ্গিসংগঠনের স্রষ্টা। যার সত্যতা হিলারি ক্লিনটনের বক্তব্য, স্নোডেনের ফাঁসকৃত তথ্য, আলজাজিরার নিউজ ইত্যাদিতে নিহিত রয়েছে।

এই জঙ্গিবাদ ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই ছড়িয়ে পড়ে। জন্ম নেয় অসংখ্য জঙ্গি সংগঠনের। জঙ্গিবাদকে তখন আর কেউ ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দেখে না, বিবর্তনে জঙ্গিবাদ হয়ে যায় আদর্শ। আর এই আদর্শে সবাই এসলামকে ছিঃ ছিঃ বলে। কারণ হিসেবে নিন্দুকেরা বলে কোর'আনে জেহাদের কথা আছে, কেতালের কথা আছে, শহীদের কথা আছে, হুরপরী পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাদের চোখে ভাসে না যে, কোর'আনে সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলা আছে। [কোরান: সুরা বাকারাহ-(১২,১৩), ২৭, ৩০, ৬০ সহ বহু আয়াত]

তাহোলে আল্লাহ তবু কেন জিহাদ-কিতালের কথা উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্ন কি নিন্দুকের মনে জাগে না?

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস যে এক জিনিস না, তা মোসলেম জাতিটি ভুলেই গেছে। তাই তারা বারবার ইহুদি খ্রিস্টানদের গভীর ফাঁদে পা দিচ্ছে। আর বিশ্ব মানুষের কাছে এসলামের নাম হয় সন্ত্রাসী ধর্ম। [জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস যে এক জিনিস নয়, তা জানতে এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা 'জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস' বইটি পড়তে পারেন]

আধিপত্যকামী শক্তিগুলোর গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস বুঝতে পেরে ISIL এর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বোলতে গিয়ে ইরানের বিশিষ্ট আলেম ও তেহরানের জুম্মা সালাহর অস্থায়ী খতিব আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ আলী মুওয়াহহিদি কিরমানি জুম্মার খুতবায় তা উল্লেখ করেন। তিনি শুধু ইরাকে আইএসআইএল-এর সন্ত্রাসবাদ ও গাজার উপর ইসরাইলের আক্রমণকে উল্লেখ করে বলেন, আজকাল ইরাকে যা ঘটছে তা শিয়া-সুন্নির দ্বন্দ্ব না, বরং মানুষকে হত্যা ও মানুষকে সহায়তার মধ্যে দ্বন্দ্ব। তিনি বিশ্বের সকল ফেরকা মাযহাবের মোসলেমদের ঐক্যবদ্ধ হোতে আহ্বান করেন। সত্যিকার অর্থেই আয়াতুল্লাহ কিরমানির এ আহ্বান অত্যন্ত যৌক্তিক। এখনো যদি বিশ্বের মোসলেম জাতিটিসহ অন্যান্য জাতিগুলো এই আধিপত্যবাদী ও মানবতার মোড়কে আবৃত ধূর্তবাজদের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তবে গাজা, ফিলিস্তিনি, হিরোশিমা, নাগাসাকি, ভিয়েতনামসহ প্রভৃতি ভূখণ্ডের মানুষদের মতো নির্যাতিত, নিপীড়িত, ধর্ষিত হয়ে মোরতে হবে। প্রত্যেকের স্বদেশ মৃত্যু উপত্যকায় রূপ নেবে। মানবতার যেটুকু আছে সেটাও হারিয়ে যাবে পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু যুদ্ধের দামামায়।

ঐক্যসূত্রের খোঁজে

মানবজাতির কমন ইন্টারেস্ট- "শান্তি"

আতাহার হোসাইন

বর্তমান পৃথিবীতে পশ্চিমা বিশ্বের সৃষ্ট বিদ্যমান বিভাজন নীতি, রাজনৈতিক দলাদলি, ভৌগোলিক স্বার্থচিন্তা বা জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিভেদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র কোরে আজ আমরা যখন পৃথিবীকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোরে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলেছি, পরস্পর মারামারি করে দুর্বল হয়ে পড়েছি তখন আমাদের প্রায় সকলের মধ্যেই এই বিভাজন ভুলে একতাবদ্ধ হওয়ার চিন্তা জাগ্রত হোচ্ছে। চিন্তাশীল ও সচেতন মানুষের কাছে বিষয়টি অপরিহার্যও হোয়ে উঠেছে। কারণ, এভাবে চলা যায় না, এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। এই পরিস্থিতিকে কিছুতেই সভ্যতা বলা যায় না। এটা যান্ত্রিক প্রগতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা একটা দানবীয় ব্যবস্থামাত্র। এই দানবীয় ব্যবস্থার কাছে কারোরই কোন মর্যাদা নেই, অধিকার নেই। এই সভ্যতা একটিমাত্র বোমা মেরে মুহূর্তের মধ্যে ২ লক্ষাধিক মানুষ খুন কোরতে পারে। তাতে সে একটুও অনুশোচনা করে না, একটুও দুঃখবোধ করে না। বরং নিজেদের শক্তিমত্তায় গর্ববোধ করে এবং কে কার চাইতে বেশি এই ধরনের বোমার মজুদ ঘটাতে পারে তার প্রতিযোগিতা করে। এরা এই ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রযুক্তি দ্বারা শক্তি অর্জন কোরে মানুষকে আতঙ্কের মুখে রেখে আনুগত্য আদায় করে, নিজেদের প্রভুত্ব আদায় করে। অন্যদিকে কেউ যেন শক্তি অর্জন করে তার সমকক্ষ না হতে পারে সে জন্য বাকিদেরকে তারা নিরস্ত্র (Unarmed) করার কথা বলে, কথা না শুনলে সব ধরনের অবরোধ (Sanctions) আরোপ করে, অবরুদ্ধ করে। এমনকি কেউ শক্তি অর্জন কোরছে তা জানতে পারলে দূর থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে কিংবা অন্যের সার্বভৌমত্বের তোয়াক্কা না করে অনুপ্রবেশ কোরে সেই প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। বিপরীত দিকে ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলোও অযৌক্তিক ও অহেতুক কিছু বিষয় নিয়ে মতভেদ করে ঐক্যহীনতার স্বাভাবিক ফল হিসেবে দিন দিন দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হোচ্ছে।

ইদানীং বিষয়টি উপলব্ধি কোরে এরা একে অপরকে ঐক্যের দিকে আহ্বান কোরছে। বিভাজন সৃষ্টির গোড়া রাজনৈতিক দলগুলো আহ্বান কোরছে তাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে, ধর্মীয় দল ও

ফেরকাগুলো আহ্বান কোরছে অন্য ফেরকা ও মাযহাবগুলোকে, আবার যারা ধর্মনিরপেক্ষ তারাও মতপার্থক্য বিসর্জন দিয়ে অন্যদেরকে মানবতার কল্যাণে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান কোরছে। আপাতত বিষয়টি ইতিবাচক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি মরুভূমির বুকে মরীচিকার মতই ঠেকছে। কারণ, সবাই যে শর্তসাপেক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তারা অপরপক্ষকে ডাকছে তাতে কোনদিনই এই ডাক ফলপ্রসূ হবে না। কারণ প্রকৃত অর্থে তারা কেউই ঐক্যের দিকে ডাকছে না, ডাকছে নিজেদের দিকে। অর্থাৎ 'আমাদের মতবাদ সঠিক, আমাদের মত মেনে নিয়ে আমাদের সাথে এক হও।' উল্টোদিকে অপরপক্ষও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে তারাই সঠিক। সুতরাং অন্যদের উচিৎ তাদের সাথে এক হওয়া। নিজেদের বিশ্বাসে ও মতবাদে কোনরূপ ছাড় না দিয়ে অন্যদেরকে যদি তারা কেয়ামত পর্যন্ত ডেকেও যায় তবুও মানবজাতির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে না। মানবজাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের প্রাচীর এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে, তারা একে অপরকে ঘৃণা, মারা-মারি, কাটা-কাটি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েই যাবে।

তাই বলি, যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এসব থেকে মুক্তি পেতে চাই, তবে আমাদেরকে এই প্রকারের শর্তযুক্ত ও হাস্যকর আহ্বান-পদ্ধতি পরিত্যাগ কোরতে হবে। কিছু কিছু বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ছাড় না দিলেও অন্যদের জন্য ছাড় দিতে হবে। এ জন্য প্রতিটি দলকেই একটি সাধারণ সুবিধাকে কেন্দ্র করে, নিজেদের মধ্যে বিরাজিত অমিলগুলোকে পেছনে ফেলে, মিলগুলোকে সামনে টেনে আনতে হবে। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা এগিয়ে যাব সেই বিষয়টিতে সবার স্বার্থ থাকতে হবে, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Common Interest. এ লক্ষ্যে একটি রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ঐক্য, সম্পর্ক নির্ধারণ ও আচরণ কোরবে দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় রেখে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে চিন্তা-ধারায় নিজস্বতা থাকতে পারে, ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে, দেশের মানুষের কষ্ট হবে এমন কাজ কোন পক্ষই কোরব না- এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই কাজে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করব, কেউ ভুল করলে শুধরে দেব। প্রতিপক্ষ আমার ভুল ধরিয়ে দিলে সেটাকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ কোরব-এমনটাই হোতে হবে সবার মানসিকতা।

দুইঃ জনে জনে অনৈক্য ও মতভেদ, মতভিন্নতা বিদ্যমান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই বেশি। যারা ধর্ম-কর্মে যত বেশি জড়িত তাদের মধ্যে তত বেশি পার্থক্য, ততবেশি দূরত্ব। এরা কখনো একমত হতে পারে না। প্রতিটি দলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মাসলা-মাসায়েলের স্তুপ বিদ্যমান। কথায় আছে, 'দুইজন আলেম এক খাটে ঘুমাতে পারে না।' এই অবস্থাটা প্রত্যেক ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'সেরাতাল মোস্তাকিম' খ্যাত এসলামে সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু এদের এই ধরনের অপকর্মের স্বাভাবিক ফল হিসেবে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে হতে এবং সারা পৃথিবীজুড়ে মার খেতে খেতে তারাও এখন নিজেদের মধ্যে ঐক্য কামনা কোরছেন। কিন্তু তাদের মধ্যেও বাধা সেই বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও ফতোয়ার পাহাড় এবং 'নিজেরা সঠিক' এই ধারণা। স্বাভাবিকভাবেই ছাগ-খুঁটি ছেড়ে এরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না। এই শ্রেণিটিও যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য চায় তাহোলে একটি Common Interest এ উপনীত হোতে হবে। কে কোন মতবাদ, কোন ফেরকায় বিশ্বাসী, কার এবাদত পদ্ধতি কেমন এইগুলোকে সামনে না এনে শুধুমাত্র যারা নিজেদেরকে আল্লাহ রসুলে বিশ্বাসী ও নিজেদেরকে মোসলেম বলে মানে তাদের সাথেই ঐক্য গড়তে হবে।

রসুলাল্লাহ নিজেই বোলেছেন, যে লা এলাহ ইল্লাহর স্বীকৃতি দেয় সে ব্যক্তি জান্নাতি। এই প্রসঙ্গে বহু হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু এটা এতটাই প্রচলিত যে সবগুলো তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। তাহোলে প্রশ্ন হোল, কেউ লা এলাহ ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসী বা স্বীকৃতি দানের পর আমরা কেন খুঁজি সে শিয়া না সুন্নি? কেউ যদি মনে করে সে সঠিক তবে আমি তার বিশ্বাসে বাধ সাধবো কেন? কারো বিশ্বাস ও কারো আমলের যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব বা অধিকার কোনটাই আল্লাহ আমাকে দেন নি। তাছাড়া দীনের ব্যাপারে, বিশ্বাসের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি কোরতে স্বয়ং আল্লাহই নিষেধ কোরে দিয়েছেন (সুরা বাকারা-২৫৬)। সেটা সম্ভবও নয়। কেউ যদি কোন আমল করে জান্নাতে চোলে যেতে পারবে বোলে একান্তই বিশ্বাস করে, তবে সেই তাই কোরুক। তাতে আমারতো কোন ক্ষতি নেই। তার কল্লা কাটতে যাওয়ার আমার কি দরকার? আর আল্লাহর জান্নাতের আয়তন এমন সীমিত নয় যে, কিছু বেশি লোক ঢুকে গেলে আমার স্থান সংকুলান হবে না।

আমি যা বিশ্বাস কোরি, যাকে শ্রদ্ধা কোরি তাতে আপনি আঘাত করবেন না, আর আপনি যা বিশ্বাস করেন বা শ্রদ্ধা করেন তাতে আমি কখনো আঘাত কোরব না- কিন্তু উভয়েই আমাদের Common Interest এর ব্যাপারে অটল থাকবো। এরপর যদি আমরা সঙ্কট মোকাবেলা করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারি এবং শান্তিময় পৃথিবী গড়তে পারি তখন নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোর মীমাংসা কোরে নেওয়া যাবে।

ভালো করে খেয়াল কোরে দেখুন তো, আল্লাহ যুদ্ধে লিপ্ত মো'মেনদেরকে আদেশ কোরছেন ধর্মের নামে যারা রাহেব হোয়েছে, সংসার ত্যাগ কোরেছে তাদেরকে সুযোগ পেলেও হত্যা না কোরতে। কারণ তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে, তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই হিসাব নেবেন। একজনের বিশ্বাস ও আমলের হিসাব অন্য জনে দেবে না। এমনকি এই ভার স্বয়ং নবী-রসুলদের উপরেও ছিল না। আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে উদ্দেশ কোরে বোলছেন, আমি আপনাকে দুনিয়াতে দারোগা পুলিশ হিসেবে পাঠাই

নি, আপনার কাজ শুধু সুস্পষ্টভাবে সত্য পৌছে দেওয়া (সুরা গাশিয়াহ-২১, ২২)। কিন্তু আমরা আজ দীনের ব্যাপারে পুলিশের দায়িত্ব পালন কোরতে চাই। কেন এই পথভ্রষ্টতা? কেন আমরা বিচারকের স্থান দখল কোরতে যাই, যে স্থান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত? এই দারোগাগিরি করতে যাওয়াটাই বাড়াবাড়ি, এটাই সীমালংঘন, আর সীমালংঘনকারীদের স্থান জাহান্নাম (সুরা আন নাবা- [X: 413.14 mm Y: 381.77 mm] ছাড়া অপরের বিশ্বাস ও আমল নিয়ে আমরা এত যে চিন্তিত- আমরা কি নিজেদের পার পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হোয়ে গিয়েছি? আমাদের পার পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় অবলম্বন হোচ্ছে আল্লাহর ক্ষমা। আর আল্লাহ যদি অন্যদেরকেও ক্ষমা করে তাঁর জান্নাত দিয়ে দেন তাতে আমার তো আপত্তি থাকার কথা নয়।

স্রষ্টা মানুষের এবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা ইত্যাদির মুখাপেক্ষী নন। তিনি নিজগুণেই মহীয়ান ও গরীয়ান। তবে তিনি বেশি খুশি হন যদি কেউ তাঁর নির্যাতিত, পীড়িত বান্দাকে খুশি করে। এই দিক দিয়ে বিচার কোরলে তাহাজ্জুদ না পোড়ে পীড়িতের সেবা করাতেই লাভ বেশি। কারণ, স্রষ্টা মানুষের কাছে এটাই চান।

ধোরুন, আপনি খুব এবাদত-বন্দেগী, উপাসনা কোরলেন। অন্যদিকে কেউ পীড়িতের সেবা কোরেই কিন্তু পার পেয়ে যাওয়ার বেশি হকদার। আপনি সেটাই কোরলেন যা স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। আর অন্যজন তাই কোরল যা আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে প্রত্যাশা করেন, যা তাঁর দরকার। আল্লাহ এটাও পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁকেই ভালোবেসে আত্মীয়-স্বজন, এয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী। [সুরা বাকারা: ১৭৭]। তাছাড়া আপনি সারা জীবন খুব এবাদত বন্দেগী কোরলে তাতে কিন্তু আপনার অহংকার জাগ্রত হতে পারে যে- আমি তো যথেষ্ট আমল কোরেছি (এবলিসের মত)! এতে আপনার মধ্যে আল্লাহর করুণা ও কৃপার আশা কমে যেতে পারে। অপরদিকে যে আমল কম কোরেছে সে নিজেকে সর্বদাই অপরাধী মনে কোরবে এবং ভাববে আমিতো ছাড়া পাবো না। এ জন্য তার হৃদয়টাই আপনার হৃদয় থেকে বেশি কোমল থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং ঐ ব্যক্তিই আল্লার করুণা বেশি পাওয়ার হকদার হোয়ে যাবেন। বাস্তব ক্ষেত্রেও এমনটাই দেখা যায়। দেখা যায় আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনকারীরা নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত মনে করায় দান-খয়রাতের ব্যাপারে তারা সাংঘাতিকভাবে কৃপণ। কিন্তু ঠিকই দান-খয়রাতের ব্যাপারে অন্যকে উৎসাহ প্রদান কোরে থাকেন। নিজেরা দানতো করেই না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে নিজেদেরকেই দান-খয়রাত প্রাপ্তির যৌক্তিক দাবিদার মনে কোরে থাকেন।

তাই বোলি, মূলে যেহেতু আমরা এক-সুতরাং এবাদত পদ্ধতিতে একটু আধটু, তাও ফরদের ব্যাপারে নয়, নফল-সুন্নাহর ভিন্নতার দোহাই দিয়ে যদি আমরা অন্যদেরকে দূরে সরিয়ে রাখি তবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা ক্রমশ লাঞ্ছিত হোতেই থাকবো, দুর্বল হতেই থাকবো। অপরদিকে ঐক্যবদ্ধ খারাপ প্রকৃতির মানুষগুলোর হাতেও আমরা মার খেতে থাকবো। আবার সুযোগ পেলে নিজেরাও অন্যদেরকে মারবো। সুতরাং এইভাবে ঐক্য সম্ভব নয়।

তিন: আন্তঃধর্মীয় ঐক্য প্রসঙ্গ:

ধর্ম মানেই স্রষ্টার বিধান। স্বাভাবিকভাবেই সকল ধর্মাবলম্বীরাই স্রষ্টায় বিশ্বাসী হোয়ে থাকেন। যে কোন ধর্মের অনুসারীরাই নিজ নিজ ধর্মের আদেশ ও নিষেধের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং আপনি ধর্মের অনুসারী হোয়ে অন্য কোন ধর্মকে অবজ্ঞা ও অসম্মান কোরতে পারেন না, যদি তা আপনার বিশ্বাসের দিক থেকে অযৌক্তিকও হয়। আপনি যদি অন্য ধর্মকে হেয় জ্ঞান কোরতে পারেন তবে অন্যরাও আপনার ধর্মকে হেয় জ্ঞান কোরবে। এতে কোরে কখনো মানবজাতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এখানে সবার ঐক্যসূত্র বা Common Interest এর স্থানটি হোচ্ছে সব ধর্মের মানুষই স্রষ্টায় বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস করে যে তাদের কাছে আসা শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের হুকুম পালন কোরলেই মানুষ শান্তি লাভ কোরবে। সুতরাং তাকে সেটাই পালন কোরতে দিন না! তা না হলে এখনকার মতই শত্রুতা বজায় থাকবে। কেউই কারো ধর্ম ভালোভাবে পালন কোরতে পারবে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাত বজায় থাকবে। প্রধান প্রধান সবগুলি ধর্মই বিশ্বাস করে যে, মানবজাতি একই দম্পতি থেকে উদ্ভূত। সুতরাং সকল মানুষই সকলের ভাই-বোন। তাহোলে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে কেন ঝগড়া কোরব? তাছাড়া আমরাতো সকলেই জানি, নিজেদের মধ্যে মারা-মারি, ঝগড়া-বিবাদ করলে তা মহান আল্লাহর সেই অভিপ্রায়- 'সমস্ত মানবজাতিকে এক জাতিতে পরিণত করা' বাধাগ্রস্ত হয়ে যায়। ধর্মের নামে এসব করে আমরা স্রষ্টারই অভিপ্রায়কে ক্ষতিগ্রস্ত কোরছি। যদি তাই হয় তবে আমাদের এবাদত উপাসনা, পূজা-অর্চনা দিয়ে কি হবে? তিনি কি এসবের মুখাপেক্ষী? না, ওসবের কিছুই কিন্তু তাঁর দরকার নেই। তিনি চান মানবজাতির মধ্যে ঐক্য ও শান্তি। তাঁর এ চাওয়ার কারণ আছে। কারণটা হলো, সৃষ্টির শুরু থেকেই মানবজাতির শান্তি অশান্তির প্রশ্নে স্রষ্টা ও এবলিসের মধ্যে চ্যালেঞ্জ চোলছে। এসব বুঝেও যারা নিজেদেরকে ধার্মিক ও শ্রেষ্ঠ দাবি করে, ধর্মের ভেদ টেনে অনৈক্য ও মারামারি বজায় রাখবেন তারা পৃথিবীতে যেমন শান্তিতে থাকতে পারবেন না, তেমনি পরকালেও জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেন না।

চার: ধর্মহীন ও নাস্তিক প্রসঙ্গ:

আগেই বোলেছি, আল্লাহ দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরতে নিষেধ কোরছেন। তিনি কাউকে দুনিয়াতে পুলিশ

কোরেও পাঠান নি। সুতরাং কেউ যদি স্রষ্টার অস্তিত্বের জন্য তাঁর দেওয়া বিভিন্ন লক্ষণ (Sign), আলামত দেখেও সন্দিহান থাকে তাহোলে তার ব্যাপারে ফয়সালা স্রষ্টার কাছেই। তথাপি আস্তিক এবং নাস্তিকের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অপরকে নিস্প্রয়োজনে পীড়ন কোরতে ভালবাসে। এই ধরনের মানুষগুলো চারিত্রিকভাবেই অপরাধী। অধিকাংশ লোক ঐক্যের পক্ষে থাকলে এরা হালে পানি পাবে না। পাশাপাশি নাস্তিক বা সন্দেহবাদীরাও মানবজাতির মধ্যে অনৈক্য চান এটা কেউ হলফ করে বোলতে পারেন না। তারাও নিশ্চয়ই মানুষের মঙ্গলের পক্ষে, কল্যাণের পক্ষে মত দিবেন। সুতরাং মানুষের হিতার্থে তারাও আস্তিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারেন। মানুষের কল্যাণ, নিজের কল্যাণই আমাদের কমন ইন্টারেস্ট হওয়া উচিৎ।

সুতরাং আমরা দেখিয়ে দিলাম যে, নাস্তিকদের সাথে আস্তিকদের, রাজনৈতিকভাবে দলাদলিতে লিপ্ত দলগুলোর, ধর্মে বিদ্যমান বিভিন্ন মাজহাব ও ফেরকার এবং আন্তঃধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হতে কোন বাধা নেই, যদি সবাই মানুষের কল্যাণকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এর পরেও যারা ঐক্যের এই ডাক এলে নানা মতপার্থক্যের দোহাই দিয়ে সাড়া না দেবে তারা আসলে শান্তি চান না। তারা ভণ্ড, প্রতারক। তারা ভুয়া মানবতাবাদী, ভুয়া দেশপ্রেমিক, ভুয়া ধার্মিক।

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী প্রতিষ্ঠিত হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এইভাবেই আহ্বান কোরে যাচ্ছে। হেযবুত তওহীদ বলছে আপনি যে ফেরকায় আছেন তাতেই থাকুন, যে মতবাদে বিশ্বাস করেন, সেটাই কোরুন। কিন্তু মোসলেম হিসাবে এক আল্লাহ, এক কোর'আন ও শেষ রসুলের প্রশ্নে সবাই এক হোন। আর অন্য ধর্মাবলম্বীরা যে ধর্মে আছেন সেখানেই থাকুন। আপনাকে ধর্মান্তরিত হোতে হবে না। কিন্তু আমরা যেহেতু একই স্রষ্টার সৃষ্টি এবং একই দম্পত্তি আদম হাওয়ার সন্তান, সুতরাং আসুন আমরা ভাই-ভাই হয়ে সকলে মিলে শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরি। যারা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন না তাদের ব্যাপারে আমাদের কথা হলো আমাদের মত আপনিও চান মানুষের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, মানুষ শান্তিতে থাকুক। সুতরাং আপনার স্রষ্টায় বিশ্বাসী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কেবল এ বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। মানবতার কল্যাণ যদি আপনি চান, সমাজে শান্তি যদি আপনি চান তবে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা কোরি। স্রষ্টা আছেন কি নেই সেটা সময় আসলে অবশ্যই ফায়সালা হবে। আপাতত আসুন আমরা সমগ্র মানবজাতি হেযবুত তওহীদের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানবজাতির Common Interest, শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরি।

আজ সর্বত্র কলেমার ভুল অর্থ প্রয়োগ করা হয়

বর্তমানের এই হীনতা, লাঞ্ছনা, অপমান থেকে অতীতের গৌরবময় অবস্থানে ফিরে যাওয়ার জন্য বর্তমানের মোসলেম জাতিকে আগে তওহীদে ফিরে আসতে হবে -হেযবুত তওহীদ

যারা দুনিয়ার কিছুমাত্র খবরও রাখেন তাদের বোলতে হবে না যে, এই পৃথিবীতে মোসলেম বোলে পরিচিত প্রায় ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যাটির কী করুণ অবস্থা। পৃথিবীর অন্য সব জাতিগুলি এই জনসংখ্যাকে পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে পরাজিত কোরছে, হত্যা কোরছে, অপমানিত কোরছে, লাঞ্ছিত কোরছে, তাদের মসজিদগুলি ভেঙ্গে চুরমার কোরে দিচ্ছে বা সেগুলিকে অফিস বা ক্লাবে পরিণত কোরছে। এই জাতির মা-বোনদের তারা ধর্ষণ কোরে হত্যা কোরছে। অথচ আমরা এক সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি ছিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য সব জাতি সভয় সম্ভ্রমসহ আমাদের পানে তাকিয়ে থাকতো। এই পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি জায়গায় শাসন ক্ষমতা এই মোসলেম বোলে পরিচিত জাতির হাতে ছিল। তারা ঐ ক্ষমতাবলে ঐ বিশাল এলাকায় আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। তখন পৃথিবীতে সামরিক শক্তিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায়, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, Technology-তে, আর্থিক শক্তিতে এই জাতি সমস্ত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ছিলো; তাদের সামনে দাঁড়াবার, তাদের প্রতিরোধ করার মত কোন শক্তি পৃথিবীতে ছিল না। এরপর তাদের ওপর নেমে এলো আল্লাহর গযব। কয়েক শতাব্দী আগে আল্লাহ ইউরোপের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলিকে দিয়ে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তাদের গোলাম, দাস বানিয়ে দিলেন। এই সামরিক পরাজয়ের পর থেকে এই শোচনীয় পতনের কারণ কী? অনেক চিন্তাশীল লোকই অনেক রকম কারণের কথা বোলেছেন;

পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমে তাঁর প্রকৃত এসলাম, যে এসলাম তিনি ১৪০০ বছর আগে তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য পাঠিয়েছিলেন সেটা আবার হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বুঝতে পেরেছেন। তিনি হেযবুত তওহীদ নামে একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা কোরে এর মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান কোরছেন খ্রিস্টানদের তৈরি করা বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত, বিপরীতমুখী এসলাম ত্যাগ কোরে আল্লাহ- রসুলের প্রকৃত এসলামে ফিরে যেতে।

আমাদের ঈমান দুর্বল হোয়ে গেছে, আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই, শিক্ষা নেই ইত্যাদি নানা প্রকার কারণ তারা পেশ কোরেছেন। আমাদের হেযবুত তওহীদের এমাম এমামুয্‌যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বোলেছেন - ওগুলো আসল কারণ নয়, ওগুলো ফল মাত্র। আসল কারণ হোল মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটি কলেমা থেকে বিচ্যুত হোয়ে গেছে। তিনি আল্লাহর কোর'আন থেকে প্রমাণ কোরেছেন যে, 'লা এলাহা এল্লাল্লাহ' এই কলেমা এসলামের আত্মা, ভিত্তি, মূলমন্ত্র। এই কলেমা ছাড়া কোন এসলাম নেই। এই কলেমা সঠিক অর্থে অন্তরে বিশ্বাস না কোরে, মুখে প্রচার না কোরে এবং এর উপর আমল না কোরে অর্থাৎ একে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম (জেহাদ) না কোরে কেউ মো'মেন বা মোসলেম হোতে পারে না। আমাদের এমাম বোলছেন, পৃথিবীময় কলেমার আজ ভুল অর্থ করা হয়। আজ সর্বত্র শেখানো হয় এবং বিশ্বাস করা হয় যে, লা এলাহা এল্লাল্লাহ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য অর্থাৎ মা'বুদ নাই। এমাম বোলছেন, কলেমা হোচ্ছে - লা এলাহা এল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই। এলাহ অর্থ মা'বুদ নয়। এলাহ হোচ্ছেন তিনি সেই সত্তা যার আদেশ শুনতে হবে, মানতে হবে, পালন কোরতে হবে অর্থাৎ সার্বভৌম। আর উপাস্য, মা'বুদ হোচ্ছেন তিনি সেই সত্তা যাকে উপাসনা করা হয়। দু'টো ভিন্ন অর্থ। এসলামের কলেমার সঠিক অর্থ হোচ্ছে শুধু আল্লাহকে এলাহ হিসাবে, একমাত্র আদেশদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা, মেনে নেওয়া অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য সকল হুকুম, বিধান প্রত্যাখ্যান করা।

যামানার এমাম বোলছেন, কলেমার এই ভুল অর্থের পরিণাম হোয়েছে এই যে, পৃথিবীর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা অর্থাৎ আমরা আল্লাহকে হুকুমদাতা, আইনদাতা হিসাবে ভুলে গিয়ে তাঁকে শুধু উপাস্য, মা'বুদ বিশ্বাস কোরে আপ্রাণ তাঁর উপাসনা কোরে, নামাজ, যাকাত, হজ্ব, রোজা কোরে আসমান জমিন ভর্তি কোরে ফেলছি, কিন্তু আমাদের সমষ্টিগত জীবনে কেউ তাঁর আদেশ, হুকুম শুনি না, পালন কোরি না। আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থা (দীন) কে বাদ দিয়ে আমরা সমষ্টিগত জীবনে ইহুদি খ্রিস্টানদের তৈরি জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরে লা এলাহা এল্লাল্লাহ থেকে অর্থাৎ কলেমা থেকে বের হোয়ে কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের হোয়ে গেছি। আজ জাতীয় জীবনে, সমষ্টিগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে পৃথিবীর কোথাও আল্লাহর আদেশ পালন করা হোচ্ছে না, মোসলেম বোলে পরিচিত দেশগুলোতেও না। সর্বত্র মানুষের নিজেদের তৈরি এবং ইহুদি, খ্রিস্টানদের তৈরি জীবন-ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া হোয়েছে আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে। এই কাজ কোরে আমরা কলেমা থেকে, এসলাম থেকে বের হোয়ে গেছি। আজ পৃথিবীর 'অতি মোসলেমরা' নামাজে, রোজায়, হজ্বে, তাহাজ্জুদে, তারাবীতে, দাড়ি, টুপি-পাগড়ীতে, পাজামায়, কোর্তায় নিখুঁত। শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে তারা নেই, সেটা হোল তওহীদ, কলেমা-- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে সামগ্রিক জীবনের বিধানদাতা, আদেশদাতা হিসাবে মানি না। যে আংশিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত ঈমান (যা প্রকৃতপক্ষে শেরক) তাদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ আজও যেমন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরে রেখেছেন, হাশরের দিনেও তেমনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবেন।

একেবারে কলেমা থেকে বিচ্যুতি ছাড়াও আমরা এ সত্য যামানার এমামের কাছ থেকে বুঝেছি যে, আল্লাহ তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে এসলাম পৃথিবীর মানুষের জন্য পাঠিয়েছিলেন তা নানা কারণে ক্রমে ক্রমে বিকৃত হোয়ে বর্তমানে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তাতে এই এসলাম আর সেই এসলামই নেই। আল্লাহর সেই প্রকৃত এসলাম যেটা আল্লাহ নবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন যারা সেটা গ্রহণ কোরল তাদের উপর তিনি দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে তারা কঠিন জেহাদের (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) মাধ্যমে সেটাকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরবে। এবং এও তিনি সাবধান কোরে দিয়েছিলেন যে, 'তোমরা যদি আল্লাহর পথে অভিযানে বের না হও তবে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন' অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের যে নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তা অন্য জাতির হাতে তুলে দিবেন। (সুরা তওবা-৩৮-৩৯)। এই জাতি ৬০/৭০ বছর আল্লাহর আদেশ মোতাবেক সংগ্রাম চালিয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে এই সত্যদীন এসলাম প্রতিষ্ঠার পর দুর্ভাগ্যক্রমে আকিদার বিকৃতির কারণে আল্লাহর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য কোরে জেহাদ পরিত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মত রাজত্ব বাদশাহী উপভোগ কোরতে আরম্ভ কোরল। আল্লাহর সাবধানবাণী কখনও মিথ্যা হোতে পারে? পারে না।

তাই তিনি ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলি দিয়ে মোসলেম জাতিটিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তাদের গোলাম বানিয়ে দিলেন। সেই গোলামি আজও চোলছে।

পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমে তাঁর প্রকৃত এসলাম, যে এসলাম তিনি ১৪০০ বছর আগে তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছিলেন সেটা আবার হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী বুঝতে পেরেছেন। তিনি হেযবুত তওহীদ নামে একটি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা কোরে এর মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান কোরেছেন খ্রিস্টানদের তৈরি করা বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত, বিপরীতমুখী এসলাম ত্যাগ কোরে আল্লাহ- রসুলের প্রকৃত এসলামে ফিরে যেতে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই বিকৃত এসলাম ত্যাগ কোরে, এ থেকে হেজরত কোরে যারা হেযবুত তওহীদে যোগ দিয়ে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত এসলামে ফিরে যাচ্ছেন তারা অর্থাৎ আমরা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাঁর অশেষ দয়ায় এই অমানিশার ঘোর অন্ধকারে তার এই বান্দাকে রসুল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই সঠিক, প্রকৃত এসলামের জ্ঞান দান কোরেছেন। আমরা পথহারা, গোমরাহ ছিলাম, আমরা খ্রিস্টানদের তৈরি করা বিকৃত, বিপরীতমুখী ধর্মটাকেই সঠিক এসলাম মনে কোরে সেটাকেই প্রাণপণে পালন কোরছিলাম, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা কোরছিলাম। আজ আমরা আমাদের সাংঘাতিক ভুল বুঝতে পেরেছি। আল্লাহর এই বান্দার মাধ্যমে আজ আমরা বুঝেছি প্রকৃত এসলাম কি, এসলামের সঠিক আকিদা কি, তওহীদ কি, ঈমান কি, এবাদত কি, মো'মেন কি, মোসলেম কি, উম্মতে মোহাম্মদী কি, হেদায়াহ কি, তাকওয়া কি, সালাতের (নামাজ) সঠিক উদ্দেশ্য কি, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, কর্মসূচি কি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ কোরতে হয়। বুঝেছি কেন সংখ্যায় মাত্র পাঁচ লাখ উম্মতে মোহাম্মদী অশিক্ষিত, চরম দরিদ্র, অস্ত্রহীন হওয়া সত্ত্বেও ৩০ বছরের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবীর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন, দু'টি বিশ্ব-শক্তিকে (Super Power) একটা একটা কোরে নয়, এক সাথে সামরিকভাবে পরাজিত, ছিন্ন ভিন্ন কোরে দিয়েছিলেন, কেন উম্মতে মোহাম্মদীর নাম শুনলে শত্রুর অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠত এবং কেন আজ এ জাতি সংখ্যায় ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও, এদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ফকিহ, মোহাদ্দেস, মোফাস্‌সের, মুফ্‌তি, আলেম, লক্ষ লক্ষ পীর দরবেশ থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, অন্য সব জাতির লাথি খাচ্ছে। আমরা আরও বুঝেছি আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন আখেরী যামানায় দাজ্জাল আবির্ভূত হবে সেই দাজ্জাল আসলে কি? বুঝেছি যে, দাজ্জাল ইতোমধ্যেই আবির্ভূত হোয়েছে এবং বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক সমস্ত পৃথিবী দাজ্জালের করতলগত হোয়ে গেছে এবং মোসলেম নামধারী এই জাতিসহ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ দাজ্জালকে প্রভু বা রব স্বীকার কোরে নিয়ে দাজ্জালের পায়ে সাজদায় অবনত হোয়ে আছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক মোমেন নয়। আল্লাহ কোর'আনে মো'মেনের সংজ্ঞা দিচ্ছেন- "প্রকৃত মো'মেন শুধু তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিশ্বাস করে, তারপর (ঈমান আনার পর) আর তাতে কোন সন্দেহ করেনা, এবং তাদের জান ও সম্পত্তি দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করে" (সুরা হুজরাত ১৫)। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত দেয়া হোল; প্রথম শর্ত হোচ্ছে আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, যার অর্থ হোচ্ছে জীবনের সর্বাঙ্গনে সেটা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি যাই হোক না কেন, যে বিষয়ে আল্লাহ বা তাঁর রসুলের কোন বক্তব্য আছে, কোন আদেশ-নিষেধ আছে সে বিষয়ে আর কাউকে না মানা। দ্বিতীয় শর্ত হোল ঐ তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। বর্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্তের একটিও নেই। তাহোলে প্রশ্ন হোচ্ছে- আল্লাহর দেয়া এই সংজ্ঞা মোতাবেক এই জাতি কি মো'মেন? অবশ্যই নয়। আর মো'মেন না হওয়ার অর্থ হয় মোশরেক না হয় কাফের। তাছাড়াও আল্লাহ কোর'আনে কাফেরের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন তা হোল - আল্লাহ যে আইন, বিধান নাযেল কোরেছেন তা দিয়ে যারা হুকুম করে না অর্থাৎ শাসনকার্য, বিচার ফায়সালা পরিচালনা (এখানে বিচার অর্থে আদালতের বিচার, শাসনকার্য সব বুঝায়, কারণ শব্দটা হুকুম) করে না তারাই কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা- ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এখানে আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিশ্বাস ও কোন প্রকার এবাদত করা বা না করার শর্ত রাখা হয় নি। অর্থাৎ যারা আল্লাহর কোর'আনে দেওয়া আইন, বিধান দিয়ে শাসনকার্য ও বিচার ফায়সালা সম্পাদন করে না তারা যত বড় মুসুল্লিই হন, যত বড় মুত্তাকি, আলেম, দরবেশ, পীর-মাশায়েখ হোন না কেন কার্যতঃ কাফের। এই আয়াতের অর্থে সমস্ত পৃথিবীর মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যা কার্যতঃ কাফের, যালেম এবং ফাসেক।

এখন এ জাতির সামনে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা হোল এ যামানার এমাম (The Leader of the Time) জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর এই ডাক গ্রহণ কোরে বর্তমানের প্রচলিত বিকৃত ও বিপরীতমুখী এসলাম ত্যাগ কোরে প্রকৃত এসলাম গ্রহণ কোরতে হবে। কলেমার সাক্ষ্য দিয়ে পুনরায় তওহীদের চুক্তিতে আবদ্ধ হোতে হবে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে হুকুমদাতা, আইনদাতা অর্থাৎ সার্বভৌম হিসাবে অস্বীকার কোরতে হবে এবং এই তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম) কোরতে হবে। ■

সনাতন ধর্মেই হোক মানবজাতির মেলবন্ধন

মোহাম্মদ আসাদ আলী

জান্নাতি ফেরকার প্রধান কাজ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছিলেন, "আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে (অর্থাৎ তিনি নিজেই), তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত। যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে মুলকান (রাজতন্ত্র), যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে অতঃপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে জাবারিয়াত (শক্তি প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন)। এরপর আবারো আসবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত।" (দালায়েলুম নবুয়াত, বায়হাকী, মুসনাদ-আহমদ বিন হাম্বল, মেশকাত)

রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হোচ্ছে। প্রথম তিনটি ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হোয়ে গেছে। বর্তমানে চোলছে জাবারিয়াত অর্থাৎ জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন। এর পরেই সামনে আসছে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত। আল্লাহর রসুলের এই কথা থেকেই বোঝা যায় যে, আখেরী যুগে, অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এই জাতি আবারো জাগবে। তাহোলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন এসে যায় যে, কাদের দ্বারা জাগবে? কারা এই ঘুমন্ত জাতির কালঘুম ভাঙ্গাবে?

আল্লাহর রসুল বোলেছেন, "আমার উম্মাহর মাঝে সকল সময়ই একদল লোক থাকবে যারা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ বলবৎ কোরবে।" একদিন মহানবী (দঃ) বোললেন, ইহুদি জাতি একাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার একটি ভাগ জান্নাতি আর সত্তরভাগ জাহান্নামী। খ্রিস্টান জাতি বাহাত্তর ভাগে বিভক্ত হোয়েছিল যার মধ্যে একাত্তর ভাগই জাহান্নামী একভাগ জান্নাতি। তাঁর শপথ যার হাতে মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ, আমার উম্মাহ তেহাত্তর ভাগে বিভক্ত হবে যার মধ্যে একটি মাত্র ভাগ জান্নাতে যাবে, বাকি বাহাত্তর ভাগই জাহান্নামে যাবে।" রসুলাল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হোল, "তারা (জান্নাতি) কারা?" তিনি জবাব দিলেন, "যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা (আসহাব) আছি।" [আবু হোরায়রা (রা.) থেকে আবু দাউদ, আউফ বিন মালেক (রাঃ) থেকে ইবনে মাজাহ]

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় আছে। রসুলাল্লাহ (দঃ) বোলেছেন- 'বনি ইসরাইল বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে গিয়েছিলো, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে এবং মাত্র একটি ফেরকা (যেটা জান্নাতি) বাদে সবগুলি ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।' অতি স্বাভাবিক কথা। কারণ যে ঐক্য ছাড়া পৃথিবীতে কোন কাজই করা সম্ভব নয়, কাজেই যে ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য আল্লাহ সরাসরি হুকুম কোরলেন- "আমার দেওয়া দীন সকলে একত্রে ধোরে রাখো এবং নিজেরা বিচ্ছিন্ন হোয়োনা" যে ঐক্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহানবী (দঃ) বোললেন, "কোর'আনের কোন আয়াতের অর্থ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কুফর" যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য বোললেন- "কান কাটা নিগ্রো ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা হয় তাহোলেও ঐক্যবদ্ধভাবে তার আদেশ নির্দেশ পালন কর" (এই ঐক্য অটুট রাখার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) কতভাবে চেষ্টা কোরেছেন তা কোর'আন এবং হাদীস থেকে দেখাতে গেলে একটি বই হোয়ে যাবে।) সেই ঐক্যকে যারা ভেঙ্গে তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে যাবে- তারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে না তো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে? জান্নাতে?

আবার যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতি হবে, সেটার সম্বন্ধে রসুলাল্লাহ বোললেন- তারা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি (দঃ) ও তাঁর আসহাব (রাঃ) কিসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর (দঃ) সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোন পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তাঁর জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও

(আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হোয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ কোরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মহৎ সংগ্রামে। সুতরাং জান্নাতি ফেরকাও অবশ্যই সেই কাজের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে বা আছে।

এই জান্নাতি ফেরকাকেই বর্তমান নামধারী মোসলেম জাতির কালঘুম ভাঙাতে হবে। তাদেরকেই এখন মাঠে নামতে হবে। জাতির কালঘুম ভাঙ্গানোর জন্য তাদের চেতনায় যতবড় আঘাত করার দরকার তাই কোরতে হবে। এই জান্নাতি ফেরকার কোন মানুষকে যদি বাকি বাহাত্তর ফেরকার কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি শিয়া না সুন্নি, না আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত, না আহলে হাদীস, হানাফি না শাফেয়ী, মালেকী না হাম্বলী না অন্য কিছু? তবে তার জবাব হবে ভাই, আমি ওসবের কোনটাই নই। আমি তো শুধু প্রাণপণে চেষ্টা কোরছি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মাদী হোতে। একটা বিল্ডিং বা এমারতের ভেতরে থাকলেই তো প্রশ্ন আসে কোন কামরায় আছি। আমরা যখন এসলামের এমারতের ভেতরেই নেই, কোন কামরায় আছি সে প্রশ্ন তো অবান্তর।

জান্নাতি ফেরকার অন্যতম কর্তব্য হবে মোসলেম নামধারী জাতিটিকে প্রশ্ন করা যে, সর্বদা আল্লাহর রসুলের সঙ্গে থেকে, তাঁর সাথে প্রতিটি সংগ্রামে সঙ্গী হোয়ে সরাসরি তাঁর কাছে থেকে যারা এসলাম কি, তা শিখেছিলেন তারাই ঠিক এসলাম শিখেছিলেন, নাকি আজকের মাওলানারা, মৌলভীরা, পীর মাশায়েখরা যে এসলাম শেখাচ্ছেন সেটা ঠিক? রসুল (সা:) বর্ণিত জান্নাতি ফেরকার কর্তব্য হবে এই জাতিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা আসলে যথেষ্ট নয়। আসল বিষয় হোল চরিত্র এবং আকীদা। একজন পবিত্র চরিত্রের উচ্চ স্তরের মানুষ আর একজন জঘন্য চরিত্রের খুনি অপরাধের মানুষের বাহ্যিক দৃশ্য, চেহারা প্রায় একই রকম। দুজনেরই হাত, পা, মাথা, মুখ সবই আছে। এমনকি ঐ দুশ্চরিত্র খুনীর বাহ্যিক চেহারা ঐ সচ্চরিত্র মানুষের চেহারার চেয়েও সুন্দর হোতে পারে। শুধু ভেতরের চরিত্রের জন্যই একজন জান্নাতি আর একজন জাহান্নামী। এমনকি পৃথিবীর বিচারেও একজন সম্মানিত, অন্যজন জেল ফাঁসির উপযুক্ত। বর্তমানে আমরা এসলাম মনে কোরে যে দীনটাকে আঁকড়ে আছি এটার বাইরের চেহারা মোটামুটি আল্লাহর রসুলের মাধ্যমে আসা দীনের মতই। বাইরে থেকে যেগুলি দেখা যায় যেমন যেকের, আসকার, নামাজ, রোজা, হজ্ব, দাড়ি, টুপি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নানাবিধ কার্যকলাপ; কিন্তু ভেতরের চরিত্র নবীজীর এসলামের একেবারে বিপরীত, সরাসরি বিপরীত। এছাড়াও জান্নাতি ফেরকার অন্যতম কাজ হবে এই জাতির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাহাত্তর ফেরকাকে ডেকে বলা যে, আপনারা যত ফেরকা, মাজহাবে বিভক্ত হোয়ে থাকুন আপনারা এক আল্লাহয়, এক নবীতে এবং এক কোর'আনে বিশ্বাসী তো? তাহোলে জাতির এই দুঃসময়ে, যখন ঐক্য এতো প্রয়োজনীয়, এখন শুধু এর উপর সবাই একত্র হোয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। মাজহাবের ফেরকার যে অনৈক্য আছে তা যদি বিলুপ্ত কোরতে না পারেন, তবে ঐক্যের খাতিরে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দিন। বাইরে আনবেন না। শিয়া শিয়াই থাকুন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মাযহাব মেনে চোলুন, যত ইচ্ছা মাতম করুন, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে, জাতীয় ঐক্যের খাতিরে সুন্নিদের পাশে এসে দাঁড়ান। সুন্নি সুন্নিই থাকুন ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যাপারে, কিন্তু জাতীয়ভাবে শিয়ার পাশে এসে দাঁড়ান। এমনভাবে হানাফি, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী ইত্যাদি যত রকমের দুর্ভাগ্যজনক জাতি ধ্বংসকারী বিভক্তি আছে সব ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এক আল্লাহর, এক নবীতে বিশ্বাসী হিসাবে, এক জাতি হিসাবে এক মঞ্চে এসে দাঁড়ান ও আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম আরম্ভ কোরুন। ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ কোরুন। যখন এই জাতি বজ্রকঠিন ঐক্যবদ্ধ ছিল তখন তাদের উন্নতি-প্রগতি কোন পর্যায়ে পৌছেছিল তা সবারই জানা। তারা অর্ধপৃথিবীর শাসনকর্তায় পরিণত হোয়েছিল, ৬০/৭০ বছরের মধ্যে এক এক কোরে নয়, একইসঙ্গে তৎকালীন পৃথিবীর দু'টি সুপার পাওয়ার রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘোটিয়েছিল। পৃথিবীতে একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ কোরেছিল। অপরদিকে আজ যখন এই জাতি সেই ঐক্যকে বিসর্জন দিয়ে তেহাত্তর (অসংখ্য) ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে গেল তখন শুরু হোল এ জাতির পতনের কাল। এই অনৈক্যের ফলে বর্তমান মোসলেম নামধারী জাতিটি পৃথিবীর সকল জাতির গোলামে পরিণত হোয়েছে। কাজেই আপনারা ঐক্যবদ্ধ হোন, বিচ্ছেদের রাস্তা না খুঁজে সংযোগের রাস্তা বের কোরুন।

এক আল্লাহই, এক রসুলে এবং এক কোর'আনে বিশ্বাসী এই জাতি যদি জান্নাতি ফেরকার এই ডাকে সাড়া না দেয় তাহোলে জান্নাতি ফেরকার কিছুই করার নেই। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে সাফ থাকবেন। তবে ডাকের মত ডাক দিতে হবে। যেমন কোরে নবী রসুলরা চিরকাল ডাক দিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করা হোয়েছে, অপমান করা হোয়েছে, নিপীড়ন করা হোয়েছে। কিন্তু তাদের ডাক বন্ধ করা যায় নি। শত অত্যাচার, সহস্র বিরোধিতা তাদের নিবৃত্ত কোরতে পারে নি। এই ফেরকার নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। এই ফেরকা জান্নাতি কেন? রসুলুল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী বোলেই তো। তাহোলে তিনি কত অত্যাচার, কত বিরোধিতা, কত অপমান ও নিগ্রহ সহ্য কোরেছেন সে সুন্নাহ তো, সে উদাহরণ তো, তাদের সামনেই আছে। তবে ভয় কিসের? জান্নাতি ফেরকা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

[যোগাযোগ: হেযবুত তওহীদ
০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫,
০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

আল্লাহ্ রসুলের প্রকৃত এসলাম ও বর্তমান বিকৃত এসলামের মধ্যে পার্থক্য

সমগ্র পৃথিবীতে আজ যারা নিজেদের মোসলেম বোলে দাবি করে তাদের বর্তমান অবস্থা কী? মধ্যপ্রাচ্যসহ সমগ্র পৃথিবীর মোসলেমদের একই অবস্থা। অন্য সকল জাতির দাস, সকল জাতির কাছে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। বর্তমানের মোসলেম দাবিদার ১৬০ কোটির এই জাতিটির করুণ দুর্দশার কারণ কী? রসুলাল্লাহর প্রকৃত এসলাম এবং বর্তমানের বিকৃত এসলামের মধ্যে নিম্নের তুলনা থেকে মোসলেমদের বর্তমান অবস্থার কারণ পরিষ্কার বোঝা যাবে।

আল্লাহর রসুলের গঠন করা জাতিটির অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার একটা তুলনা

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম	বর্তমান বিকৃত এসলাম
১। সংখ্যায় পাঁচ লাখের মত।	১। সংখ্যায় প্রায় একশ' ষাট কোটি।
২। জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ- শূন্য, কিছুই ছিলো না।	২। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক। যে তেল ও গ্যাস ছাড়া বর্তমান ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা অচল, সেই তেলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং গ্যাসের একটা বিরাট অংশ এই জাতির হাতে। এ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের এক প্রধান অংশের মালিক।
৩। ঐ পাঁচ লাখের জাতির মধ্যে মাত্র ৪০ জনের মত লোক লেখাপড়া জানতেন।	৩। বর্তমানে এই জাতির মধ্যে কোটি কোটি লোক লেখাপড়া জানে, লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাফেজে কোরআন, ফকিহ, মোহাদ্দেস, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি সবই আছে।
৪। ঐ জাতির কাছে আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোর'আনের মাত্র কয়েকটি হাতে লেখা কপি ছিল, তাও খলিফা ওসমানের (রাঃ) সময়ের পরে।	৪। বর্তমানে এই জাতির কাছে কোরআনের কোটি কোটি কপি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। একমাত্র বাইবেলের সংখ্যার সাথে কোরআনের সংখ্যার তুলনা করা যায় এমনকি অনেকের মতে বাইবেলের চেয়েও বেশি।
৫। কোরআনের কোন অনুবাদ ছিলো না।	৫। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ভাষায় কোরআনের একাধিক অনুবাদ হোয়ে গেছে। এমনকি অনেক আঞ্চলিক ভাষায়ও এর অনুবাদ হোয়ে গেছে।
৬। অর্ধেক বিশ্বজয়ী ঐ জাতির বহু মানুষ বই আকারে কোরআনকে কোনদিন চোখেই দেখেননি। তাদের মধ্যে যার যেটুকু মুখস্থ ছিলো তারা সেইটুকুই জানতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ কোরতেন।	৬। বর্তমানে ঝকঝকে হরফে ছাপানো অতি সুন্দর কোরআন পৃথিবীতে কোটি কোটি সংখ্যায় বর্তমান। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐ বিরাট কোরআন মুখস্থ।
৭। কোরআনের লিখিত কোন ব্যাখ্যা অর্থাৎ তফসির ছিলো না।	৭। বর্তমানে কোরআনের শত শত তাফসির ও হাজার হাজার ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ মোফাসসের আছেন।
৮। ঐ জাতি ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ ছিলো। সমগ্র জাতি ছিল একটি জাতি, তাদের নেতা (এমাম) ছিলেন একজন, দীন (জীবনব্যবস্থা) ছিল একটি- আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন।	৮। বর্তমানের এই জাতিটি রাজনৈতিকভাবে পঞ্চান্নটির মত ভৌগোলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মাযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরিকায় এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের নকল কোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তাদের কেন্দ্রীয় কোন নেতৃত্ব নেই, নির্দিষ্ট কোন দীন নেই, ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের তৈরি করা সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ইত্যাদি নানা জীবনব্যবস্থার (দীন) তারা অনুসারী। তাদের নেতৃত্বও শত সহস্রভাগে বিভক্ত।

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম	বর্তমান বিকৃত এসলাম
৯। তদানীন্তন সভ্য পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, রোমান এবং পারসিক বিশ্বশক্তির নাম শুনলে ভয়ে কম্পমান আরব জাতিকে সেই এসলাম মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় রূপান্তরিত কোরেছিলো যে ঐ মহাশক্তিধর রোমান এবং পারসিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামনে ঝড়ের মুখে তুলোর মত উড়ে গিয়েছিলো; একবার নয়, বহুবার। যে আরবদের তারা মাত্র কয়েক বছর আগেই অবজ্ঞা কোরতো, পরে তাদের নাম শুনলেই তারা ভয়ে কাঁপতো	৯। বর্তমান এসলাম এমন জাতি সৃষ্টি করে এবং কোরছে যারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই খ্রিস্টানরা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র এবং সে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোঝার শক্তিও এ জাতির নেই। অন্যান্য জাতিগুলোর বিরুদ্ধতা করার শক্তিও নেই। কখনও কোরলে পরাজয় ও অপমান অবধারিত।
১০। বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দ:) নেতৃত্বে সেই এসলাম দশ বছরের মধ্যে সৃষ্টি কোরেছিলো খালেদ বিন ওয়ালিদের (রা:) মত আল্লাহর তলোয়ার, আলী বিন আবু তালিবের (রা:) মত আল্লাহর সিংহ এবং দেরারের (রা:) মত বহু অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।	১০. বর্তমানের এই এসলাম ১৬০ কোটির জাতির মধ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেও একটি মাত্র খালেদ, একটি আলী বা একটিও দেরার (রা:) সৃষ্টি কোরতে পারে নাই।
১১। আল্লাহর- রসুলের সেই এসলাম অতি শান্ত মেজাজের, সুফী চরিত্রের আবু ওবায়দা (রা:) কে এমন অজেয় যোদ্ধা ও অপরাজেয় সেনাপতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল যে তার নেতৃত্বে সেই উম্মাহ সমস্ত উত্তর সিরিয়া জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। শুধু সেনাপতি হিসাবে নয়, একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ Single combat-এ ঐ স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটি রোমান এবং পারসিকদের প্রখ্যাত যোদ্ধাদের পরাজিত ও ধরাশায়ী কোরেছেন।	১১। আর আজ ধর্ম সম্বন্ধে বেখেয়াল, বেপরোয়া কিন্তু সাহসী ও দাপটওয়ালা কোন মানুষকে যদি বর্তমানের এসলামের ধার্মিক বানানো যায় তবে ঐ লোকটি অচিরেই একটি নিরীহ গো-বেচারা কাপুরুষে পরিণত হোয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ-রসুলের সেই প্রকৃত এসলাম একটি শিয়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করে আর আমাদের বর্তমানের এই এসলাম সিংহকে শিয়ালে পরিণত করে।
১২। আল্লাহর রসুলের এসলাম নির্জনবাসী কামেল সুফী সাধক ওয়ায়েস করনি (রা:) কে নির্জনবাস থেকে বের কোরে এনে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ কোরেছিলো।	১২। আর বর্তমানের এই এসলাম যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার হাতে তসবীহ ধোরিয়ে দিয়ে মসজিদে, হুজরায় আর খানকার নির্জনবাসে বসিয়ে দেয়। এই জাতির মধ্যে জন্ম নেয় ফকিহ, মোহাদ্দেস, মোফাসসের, আল্লামা, সুফী, পীরে কামেল ও বুজুর্গানে দীন ইত্যাদি উপাধির অন্তর্মুখী, মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষের দল।
১৩. আল্লাহর রসুলের এসলাম যে জাতি গঠন কোরেছিলো সে জাতির চরিত্রের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যোদ্ধার চরিত্র, তার প্রমাণ জাতির নেতা আল্লাহর রসুল (দ:) সহ সমস্ত জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যেত না যার শরীরে অস্ত্রের আঘাত নেই।	১৩. বর্তমানের এসলাম যে জাতি গঠন করে তার চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে কাপুরুষতা। ছোট বড় সমস্ত রকম সংঘর্ষ, বিপদ-আপদ থেকে পলায়ন। যে যতো বেশি ধার্মিক সে তত বেশি কাপুরুষ; অস্ত্রের আঘাত তো দূরের কথা, এদের গায়ে সুঁচের খোঁচারও দাগ নেই।
১৪। আল্লাহর রসুলের এসলাম সম্পূর্ণ উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ থেকে এমনভাবে বের কোরে দিয়েছিলো যে তাদের শতকরা আশি জনের কবর হোয়েছে বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে। জাতিটি গঠিত হবার পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানীন্তন পৃথিবীর দু'টি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত কোরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী কোরেছিলো। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দু'টি ছিলো রোমান ও পারসিক, একটি খ্রিস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্র-শস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দু'টি বিশ্বশক্তি ছিলো ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হোয়ে গিয়েছিলো। এই পর্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস শুধু জয়ের ইতিহাস, বিজয়ের	১৪. বর্তমানের এসলাম এমন জাতি তৈরি করে এবং কোরছে যারা তসবিহ হাতে মসজিদে, খানকায় বোসে থাকে এবং কোন রকম বিপদের আভাস পেলেই হাওয়ার বেগে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখ না কোরে পারছিনা। কাশ্মীরে মোজাহেদদের পাতা মাইন ফেটে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্য আহত হওয়ায় তারা রেগে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিছু দূরেই একটি মসজিদ ছিলো এবং সেখানে নামাজের জন্য বর্তমান এসলামের মুসল্লিরা সমবেত হোয়েছিলেন। গুলির শব্দে ঐ মুসল্লিরা প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হোয়ে দৌড়ে মসজিদ থেকে বের হোয়ে পালাতে যেয়ে নয় জন এক কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। পাঁচজন ঐখানেই মারা যান এবং চারজনের খবর জানা যায় নাই। খবরটা এদেশের সব দৈনিকেই বের হোয়েছিলো - আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ১০ই সেপ্টেম্বরের New-nation (১৯৯৪) থেকে। সম্প্রতি আমাদের দেশেও এরকমই

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম	বর্তমান বিকৃত এসলাম
ইতিহাস, তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক বিজয়ের ইতিহাস।	একটি ঘটনা ঘোটেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল কোরতে গিয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এমাম সাহেবরা এমনভাবে পালিয়েছেন যে পালাতে গিয়ে দিশেহারা হোয়ে কয়েকজন ঝাঁপ দিয়েছেন পদ্মা নদীতে। এর তিনদিন পরে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয় (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩- দৈনিক ইত্তেফাক)। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশেহারা হোলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মোরতে পারে। এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে এদেশেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরূপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন সমাবেশে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘোটবে।
১৫. আল্লাহর রসুলের এসলাম তার জাতির মধ্যে যে নারী সৃষ্টি কোরেছিলো তাদের মায়েরা নিজেদের ছেলেদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে হাত তুলে দোয়া কোরতেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসে। তুমি তার শাহাদাৎ কবুল কর।	১৫. বর্তমানের এসলামে যুদ্ধতো নেই-ই, যদি ব্যতিক্রম হিসাবে কোন ছেলে মানবজীবনে শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে সংগ্রাম (জেহাদ) করার জন্য মায়ের অনুমতি চায় তবে তার মা চিৎকার করে অজ্ঞান হোয়ে যান।
১৬. আল্লাহর রসুলের এসলামের মেয়েরা রসুলাল্লাহর (দঃ) পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ কোরেছেন এবং রসুল (দঃ) দুনিয়া থেকে চোলে যাবার পর অস্ত্র ও তাবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে খ্রিস্টানদের শিক্ষিত যোদ্ধাদের পরাজিত কোরেছেন।	১৬. বর্তমানে এসলামের ধার্মিক মেয়েদের তাদের বাক্সবন্দী অবস্থা থেকে বের কোরে চৌরাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসলে তারা ওখান থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন।
১৭. আল্লাহর রসুলের এসলাম এতটাই সহজ সরল ছিল যে পশ্চাদপদ, নিরক্ষর, বাকি দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ আরবদেরও বুঝতে কোন অসুবিধা হোত না।	১৭. বর্তমানের এসলাম এতই জটিল ও দুর্বোধ্য একটি বিষয় যা বুঝতে হোলে জীবনের বড় একটি অংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়া কোরতে হয়, যার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাসিল করা এবং মেনে চলা কোন মানুষের একজীবনে সম্ভব নয়।
১৮. এসলামের আনীত সামরিক কুচকাওয়াজ সালাহ'র অপরূপ সৌন্দর্য বহু বিধর্মীকে এসলামের প্রতি আকৃষ্ট কোরেছিল। সেই সালাহ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিল ইস্পাতের মত ঐক্য, পিঁপড়ার মত শৃঙ্খলা, মালায়েকের মত আনুগত্য, কঠিন সময়ানুবর্তীতা, আল্লাহ যা কিছু নিষেধ কোরেছেন তার থেকে এবং শেরক ও কুফর থেকে হেজরত করার মত চরিত্র সৃষ্টি কোরেছিল।	১৮. পক্ষান্তরে বর্তমানের মসজিদগুলিতে মুসল্লিরা মাথার সামনে নোংরা জুতা রেখে সালাহ করেন যেন অপর কোন মুসল্লি সেগুলি চুরি না কোরতে পারে। সমাজের বহু দুর্নীতিবাজ ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি রোয়েছেন যাদের কপালে সেজদা কোরতে কোরতে কড়া পড়ে গেছে। বর্তমান এসলামের সালাহ তাদেরকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি।
১৯. প্রকৃত এসলামে যাকাত ছিল একটি জাতীয় খাত। জাতীয়ভাবে ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হোত এবং প্রাপ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হোত। এসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়নের ফলে একটা সময় পরে এসে সমাজে এমন স্বচ্ছলতা এসেছিল যে সদকা এবং যাকাতের অর্থ নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।	১৯. বর্তমানের এসলামে যাকাত একটি ব্যক্তিগত দানের বিষয়। ধনী লোকেরা লোক দেখানোর জন্য যাকাতের কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করে এবং সেই যাকাত নিতে এসে পায়ের তলে পিষ্ট হোয়ে মারা যায় বহু হত দরিদ্র মানুষ।
২০. আল্লাহ ও রসুল (দঃ) হজ্বের মাধ্যমে ব্যবস্থা কোরে দিয়েছেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা মোসলেম জাতির প্রতিনিধিরা বছরে একবার মক্কায় এবং আরাফাতের ময়দানে একত্র হোয়ে তাদের জাতীয় সমস্যা পর্যালোচনা কোরবে, পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে, উম্মতে মোহম্মদীর উপর আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (দঃ) যে মহাদায়িত্ব অর্পিত আছে তা কতদূর অগ্রসর হলো, এখন কি কি বাধা আসছে এবং কেমন কোরে সে সব অতিক্রম কোরতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ কোরে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির কোরবে। অর্থাৎ হজ্ব হোচ্ছে বিশ্ব-মোসলেমের বার্ষিক মহা সম্মেলন।	২০. বর্তমানের বিকৃত আকীদার মোসলেমরা, মহা আবেদরা আত্মার উন্নতির জন্য হজ্ব কোরতে যান। চুপচাপ যান, চুপচাপ ফিরে আসেন। অন্যের সমস্যা, অন্যের বিপদে তাদের কী আসে যায়? বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য জাতি দ্বারা মোসলেমরা লাঞ্ছিত হোচ্ছে হোক, মোরছে মোরুক, বাড়ি-ঘর ছাড়া হোচ্ছে হোক, না খেয়ে মোরছে মোরুক, হাজার হাজার মোসলেম মেয়েরা ধর্ষিতা হোয়ে গর্ভবতী হোচ্ছে, হোক, তাতে হাজীদের কী আসে যায়? তাদের আত্মার ধোয়ামোছা
২১. মসজিদ ছিল উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। সালাহ কায়েম করা ছাড়াও মসজিদ থেকেই প্রেরিত হোত সেনাবাহিনী, মসজিদেই খলিফার সাক্ষাৎ কোরতেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ, জুমার দিনে মসজিদেই বোসত আদালত, সাজা দেওয়া হোত অপরাধীদের। প্রতি ওয়াক্তে নারী ও পুরুষ সকলেই সালাতে অংশ নিত। মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, জীবন্ত।	

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম	বর্তমান বিকৃত এসলাম
২২. ঐ জাতির মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোন বিভাজন ছিল না। অর্থের বিনিময়ে ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য আলাদা একটি পুরোহিত শ্রেণি অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লা শ্রেণির কোন অস্তিত্বই ছিল না। এসলামের প্রতিটি কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করা হোত। জাতির প্রতিটি মানুষের জীবনের লক্ষ্য ছিল সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীন সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা।	হোলেই হলো। অথচ বিশ্বনবী (দঃ) বোলেছেন- এই জাতিটি একটি শরীরের মত, এর কোথাও ব্যথা হোলে তা সমস্ত শরীরকে অসুস্থ করে [বোখারী, মোসলেম, মেশকাত]। অর্থাৎ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা এই উম্মাহর যে কোন স্থানে আঘাত লাগলে তা সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। এই জাতির পিতা এই জাতির যে সংজ্ঞা দিলেন সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আজকের হাজীরা কি তাঁর উম্মতের হাজী? এদের হজ্বের উদ্দেশ্য যেন কেবল নামের আগে 'আলহাজ্ব' উপাধি সংযোজন করা। ২১. বর্তমানের মসজিদে নামাজ পড়া ছাড়া আর কোন কাজ করা নিষেধ, এমনকি অনেক মসজিদে লেখা থাকে 'মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম'। বর্তমানে মসজিদে বোলতে গেলে মেয়েদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। বর্তমানের মসজিদগুলি নিস্প্রাণ, অধিকাংশ সময়েই গেটে তালা ঝুলানো থাকে। ২২. বর্তমানের এই জনসংখ্যাটি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত। এক) দীন সম্পর্কে অজ্ঞ, শিক্ষাবঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, দুই) বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা যেমন- নামাজ পড়ানো, মুর্দা দাফন করা, কবর জেয়ারত করা, মিলাদ পড়া, দোয়া করা, ওয়াজ নসিহত করা, পীর মুরিদি করা ইত্যাদির জন্য ব্রিটিশদের তৈরি মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে আসা আলেম মোল্লা নামক আলাদা একটি শ্রেণি, ৩) সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এসলাম বিমুখ একটি শ্রেণি যারা নিজেদের মোসলেম পরিচয় ও ধর্ম সম্পর্কে গভীর হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন এবং পাশ্চাত্যের মানসিক দাস। পাশ্চাত্যের তৈরি সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতিকে নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য নিবেদিতপ্রাণ। জাতির বৃহত্তর অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের আখেরাতের মুক্তির জন্য যায় ঐ ধর্মব্যবসায়ী আলেম পুরোহিত শ্রেণীর নিকট, আর জাগতিক সকল প্রয়োজনে যেমন কোর্ট কাচারি, বিচার, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশাসনিক বিষয়াদি, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য যায় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটির নিকট।

এরকম আরও অনেক তুলনা দেওয়া সম্ভব যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্তমানের প্রচলিত এসলাম আর রসুলাল্লাহর প্রকৃত এসলাম সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি জিনিস। কাজেই এই বিকৃত এসলামকে অনুসরণকারী কার্যত কাফের মোশরেকদের ভাগ্যে বর্তমানের এই দুঃখ, দুর্দশা ছাড়া কিইবা জুটবে। এরপরও এই জাতির কালঘুম ভাঙছে না। এ জাতি ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরছে না। যতদিন এই জাতি ঐক্যবদ্ধ না হবে, রসুলাল্লাহর প্রকৃত এসলামে ফিরে না আসবে ততদিন এই জাতির উন্নতি, প্রগতি সম্ভব নয়। মাননীয় এমামুয্যামান ও তাঁর অনুসারী তথা হেযবুত তওহীদের সদস্যগণ মানবজাতিকে সেই প্রকৃত সত্যের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ
০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]

দাজ্জাল তার বাম চোখ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পায় কিন্তু ডান চোখ অন্ধ বলে সুন্দর এই প্রকৃতির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

একচোখা দাজ্জালের পায়ে সাজদাবনত মানবজাতি

চৌদ্দশ' বছর থেকে মোসলেম উম্মাহর ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ বহু এসলামী চিন্তাবিদ, জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের ধ্বজাধারী তথাকথিত আলেম মাওলানারা দাজ্জালকে নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, গবেষণা কোরেছেন। দুর্ভাগ্যবশত তারা রসুলাল্লাহর দাজ্জাল সম্পর্কিত রূপক বর্ণনাগুলিকেই বাস্তব হিসেবে ধরে নিয়ে এক মহা শক্তিশালী দানবের আশায় বসে আছেন। তাদের এই বিকৃত আকিদার ফলশ্রুতিতে তারা ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে আসা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকারকারী এবং নিজেকে রব দাবিদার একচোখা দানব দাজ্জালকে চিনতে পারছেন না। তারা বুঝতে পারছেন না যে তাদের অজান্তেই মানবজাতির মহাবিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে আজ থেকে ৪৭৭ বছর আগেই দাজ্জালের জন্ম হোয়েছে এবং বর্তমানে সে তার শৈশব-কৈশোর পার হোয়ে যৌবনে উপনীত। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এ যামানার এমাম, এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কোর'আন-হাদিস-বাইবেল, ইতিহাস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ কোরেছেন যে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতাই (Judeo-Christian Materialistic Civilization) হোল রসুলাল্লাহ বর্ণিত দানব দাজ্জাল। দাজ্জাল সম্পর্কে লেখা যামানার এমামের "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা'!" বইটি পাঠক মহলে ব্যাপক আলোচিত এবং আলোড়িত বিষয়, যা ছিল ২০০৮ সালের বাংলাদেশের বেস্ট সেলার বই। উক্ত বইয়ের আলোকে দাজ্জাল বিষয়ক কিছু পর্যালোচনা এখানে তুলে দেওয়া হোল।

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- দাজ্জাল ইহুদি জাতির মধ্যে থেকে উত্থিত হবে এবং ইহুদি ও মোনাফেকরা তার অনুসারী হবে। [ইবনে হানবাল (রাঃ) থেকে মোসলেম]

এই হাদিসটির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। কারণ বর্তমানের জড়বাদী (Meterialistic) সভ্যতা যে ইহুদি জাতি থেকে জন্মেছে তা সকলেরই জানা। তাছাড়া এই সভ্যতার প্রচলিত নামই হোচ্ছে ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা (Judeo-Christian Technological Civilization)। নামকরণেই বংশ পরিচয় স্বীকার কোরে নেয়া হোয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যে এর অনুসারী হবে তা তো স্বাভাবিক কিন্তু মহানবী যে মোনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত কোরলেন তার অর্থ হোচ্ছে এই যে, মোসলেম বোলে পরিচিত এই জাতিটি প্রায় সম্পূর্ণটাই দাজ্জালকে তার দাবি মোতাবেক রব অর্থাৎ প্রভু বোলে মেনে নেবে এবং নিয়েছে। মোনাফেকদের সংজ্ঞা অর্থাৎ 'মুখে এক কথা বলা

আর কাজে অন্যটা করা' অনুযায়ী এরা মোনাফেকের পর্যায়ে পড়ে। নিজেদের মোসলেম বোলে পরিচয় দিয়ে, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাহ ও নানাবিধ এবাদত কোরেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের শেখানো মানুষের সার্বভৌমত্বকে জাতীয় জীবনে স্বীকার কোরে নেয়া যদি মোনাফেকী না হয় তবে আর মোনাফেকী কী?

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- দাজ্জাল নিজেকে মানুষের রব, প্রভু বোলে ঘোষণা কোরবে এবং মানবজাতিকে বোলবে তাকে রব বোলে স্বীকার কোরে নিতে। [বোখারী]

দাজ্জালের এই দাবি "আমাকে প্রভু বোলে স্বীকার করো" এর অর্থ কী? এর অর্থ হোচ্ছে এই যে দাজ্জাল পৃথিবীর মানুষকে বোলবে যে, আমি মানুষের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থা দিচ্ছি, যে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা-ব্যবস্থা দিচ্ছি তা তোমরা গ্রহণ ও প্রয়োগ করো। তোমরা বহু পুরাতন বেদ, মনু-সংহিতা ও কোর'আন-হাদিস নিঃসৃত যে আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি জীবনে প্রয়োগ কোরছিলে তা পুরানো, অচল ও বর্বর; ওগুলো ত্যাগ কোরে আমি যে অতি আধুনিক আইন-কানুন দিচ্ছি তা গ্রহণ করো ও তোমাদের সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োগ করো। তাহোলে তোমরা আমাদের মতো সভ্য হবে, সমৃদ্ধিশালী, ধনী ও শক্তিশালী হবে। তোমাদের জীবন যাত্রার মান আমাদের মতো উন্নত হবে। আমরা যেমন স্বর্গসুখে আছি তোমরাও এমনি স্বর্গসুখ ভোগ কোরবে। দাজ্জাল রব, প্রভু হবার দাবি কোরছে কিন্তু স্রষ্টা হবার দাবি কোরছে না। পাশ্চাত্যের ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা ও শক্তি ঠিক এই প্রভুত্বের, রবুবিয়াতের দাবিই কোরছে, মানুষের স্রষ্টা হবার দাবি কোরছে না। সে বোলছে ব্যক্তিগত জীবনে তোমরা হিন্দু, মোসলেম, খ্রিস্টান, ইহুদি, জৈন, বৌদ্ধ যা থাকতে চাও থাকো এবং যতো খুশি তোমাদের আল্লাহকে, ঈশ্বরকে, গডকে, এলীকে ডাকো। যতো খুশি নামাজ পড়ো, রোজা করো, হজ্ব করো, প্রার্থনা করো আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু সমষ্টিগত জীবনে আমার রবুবিয়াহ্, প্রভুত্ব মেনে নাও। এখানে তোমাদের স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান কোরে আমি যে জনগণের, একনায়কের, কোন বিশেষ শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠের অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি কোরেছি, তার যে কোন একটাকে মেনে নাও। আজ মানবজাতি দাজ্জালের ঐ দাবি মেনে নিয়েছে এবং মেনে নেয়ায় দাজ্জাল মানবজাতিকে তার কাছে যে জান্নাতের মতো জিনিসটি আছে তাতে প্রবেশ কোরিয়েছে। তাই আজ সমস্ত মানবজাতি জাহান্নামের আগুনে পুড়ছে। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নেই। একটি মাত্র দম্পতি থেকে সৃষ্ট হোয়েও, একটিমাত্র জাতির অন্তর্ভুক্ত হোয়েও (কোর'আন- সুরা বাকারা, আয়াত ২১৩; সুরা ইউনুস, আয়াত ১৯; সুরা নেসা, আয়াত ১) মানুষ একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কোরছে, আগুনে পুড়িয়ে মারছে, তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নারীদের ধর্ষণ কোরছে। দাজ্জালের অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে কেউ কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হোয়ে জঘন্য বিলাস-ব্যাসনের মধ্যে ডুবে আছে আর কেউ না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, খেতে, পরতে দিতে না পেরে নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চা সন্তানদের হত্যা কোরে নিজেরা আত্মহত্যা কোরছে, মা গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা কোরছে, পেটের সন্তান অন্যের কাছে বিক্রি কোরে দিচ্ছে; আল্লাহর দেয়া দণ্ডবিধি প্রত্যাখ্যান কোরে দাজ্জালের দণ্ডবিধি গ্রহণ করায় সর্বরকম অপরাধ চুরি- ডাকাতি, হাইজ্যাক, অপহরণ, ছিনতাই, খুন-জখম, ধর্ষণ প্রতি দেশে, প্রতি জাতিতে ধাঁ ধাঁ কোরে বেড়ে চোলেছে; আল্লাহর দেয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা ত্যাগ কোরে দাজ্জালের দেয়া আত্মাহীন, আল্লাহহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মানুষ তার নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে।

আজকের ফিলিস্তিনের অবস্থা দেখুন। সেখানে মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষ দাজ্জালকে প্রভু বলে না মানায় তাদের উপর নেমে এসেছে অমানুষিক নির্যাতন। যদিও ঐ ভূখণ্ডেও দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত। শুধু কিছু বিষয়ে দাজ্জালের প্রভুত্ব মানতে তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে তাদের এই করুণ পরিণতি। বর্তমানে মোসলেমসহ সমগ্র মানবজাতিই দাজ্জালকে রব বোলে স্বীকার কোরে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। সাজদা অর্থ আত্মসমর্পণ, কাউকে সাজদা করার অর্থ তার কাছে আত্মসমর্পণ কোরে তার আদেশ নির্দেশ মেনে চলা- তাই আল্লাহ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা নিষেধ কোরেছেন। কিন্তু মোসলেমসহ সমস্ত মানবজাতি আজ দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতার পায়ে আত্মসমর্পণ কোরেছে, তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। এক কথায় এবলিস মানবজাতিকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে, তওহীদ থেকে বিচ্যুত কোরে তাকে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত করার যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহকে দিয়েছিলো আজ তাতে সে সক্ষম হোয়েছে, আজ সে জয়ী অবস্থায় আছে।

একটি হাদিসে আল্লাহর রসুল বোলেছেন– দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। [আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম]

দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হবে অর্থ সে ডান চোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না, যা দেখবে সবই বাঁ চোখ দিয়ে। আল্লাহ যা কিছু তৈরি কোরেছেন সব কিছুরই দু'টো বিপরীত দিক আছে। এই মহাসৃষ্টিও দৃশ্য ও অদৃশ্য, কঠিন ও বায়বীয়, আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি, দিন ও রাত্রি ইত্যাদি বিপরীত জিনিসের ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাঁর যে খলিফা পাঠালেন সেই মানুষের জন্যও তিনি নির্ধারিত কোরলেন বিপরীতমুখী বিষয়। তার জন্যও তিনি নির্দিষ্ট

কোরলেন দেহ ও আত্মা, জড় ও আধ্যাত্মিক, সত্য ও মিথ্যা, সওয়াব ও গোনাহ, ভালো ও মন্দ, ইহকাল ও পরকালের ভারসাম্যযুক্ত সমন্বয়। এই দুইয়ের ভারসাম্যই হোচ্ছে স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। তাঁর এই খলিফার জন্য যে দীন, জীবন-বিধান তিনি তাঁর নবী-রসুলের মাধ্যমে প্রেরণ কোরলেন সেটার এক নাম দীনুল ফিতরাহ, প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক জীবন-ব্যবস্থা এবং সেই দীন যারা মেনে চোলবে আল্লাহ তাদের নাম দিলেন মিল্লাতান ওয়াসাতা, ভারসাম্যযুক্ত জাতি (কোরআন- সুরা বাকারা, আয়াত ১৪৩)। এই ভারসাম্যের দু'দিকের যে কোন দিককে বাদ দিলেই ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যাবে ও অস্বাভাবিক অপ্রাকৃতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আল্লাহ তাঁর খলিফা, মানুষ সৃষ্টি কোরে যে পরীক্ষা কোরতে চান তা ব্যর্থ হোয়ে যাবে।

পথভ্রষ্ট বনি-ইসরাইল জাতিকে হেদায়াত করার জন্য প্রেরিত আল্লাহর নবী ঈসার (আ:) প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তাঁর শিক্ষাকে ইউরোপের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি কোরলো। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাবিহীন একটা ভারসাম্যহীন ব্যবস্থা, যেটার উদ্দেশ্যই ছিলো শুধু আত্মশুদ্ধির পরিত্যক্ত প্রক্রিয়াকে (তরিকা) পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেটা মানুষের সার্বিক জীবনে অচল, এটা সাধারণ জ্ঞানেই (Common sense) বোঝা যায়। এই অচল ব্যবস্থাকে চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হোলে ইউরোপ যখন মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সংবিধান, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি তৈরি কোরে নিলো তখন তারা জীবনের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কোরে ফেললো। দু'চোখ দিয়ে না দেখে এক চোখ অন্ধ কোরে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখতে শুরু কোরলো। অন্ধ কোরল ডান অর্থাৎ দক্ষিণ চোখটাকে।

ডান এবং বামের মধ্যে ডানকে নেয়া হয় উত্তম ও বামকে নেয়া হয় অধম হিসাবে। কেয়ামতের দিন জান্নাতিদের আমলনামা, তাদের কাজের রেকর্ড বই দেয়া হবে ডান হাতে, জাহান্নামীদের দেয়া হবে বাম হাতে (কোরআন- সুরা হাক্কাহ্, আয়াত ১৯, ২৫ ও সুরা ইনশিকাক, আয়াত ৭)। দেহ ও আত্মার মধ্যে আত্মা ডান দেহ বাম, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সত্য ডান মিথ্যা বাম, ইহকাল ও পরকালের মধ্যে পরকাল ডান, ইহকাল বাম, জড় ও আধ্যাত্মের মধ্যে আধ্যাত্ম ডান, জড় বাম ইত্যাদি। ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার (Judeo-Christian Materialistic Civilization) ডান চোখ অন্ধ অর্থাৎ জীবনের ভারসাম্যের একটা দিক, আত্মার দিক, পরকালের দিক, অদৃশ্যের (গায়েব) দিক, সত্যের দিক সে দেখতে পায় না, তার সমস্ত কর্মকাণ্ড জীবনের শুধু একটা দিক নিয়ে, দেহের দিক, জড় ও বস্তুর দিক, যন্ত্র ও যন্ত্রের প্রযুক্তির দিক, ইহকালের দিক, কারণ শুধু বাম চোখ দিয়ে সে জীবনের ঐ একটা দিকই দেখতে পায়। তাই বিশ্বনবী বোলেছেন, দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে। এই ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' শক্তিশালী দুরবিন দিয়ে তার বাঁ চোখ দিয়ে এই মহাবিশ্ব, এই বিশাল সৃষ্টিকে দেখতে পায়। কিন্তু তার ডান চোখ অন্ধ বোলে এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে দেখতে পায় না; অণু-পরমাণু থেকে শুরু কোরে বিশাল মহাকাশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি বস্তু যে এক অলংঘনীয় বিধানে বাঁধা আছে তা দাজ্জাল তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু ডান চোখ নেই বোলে এই মহাবিধানের বিধাতাকে দেখতে পায় না। শিশুর জন্মের আগেই মায়ের বুকে তার খাবারের ব্যবস্থা করা আছে তা দাজ্জালের চিকিৎসা বিজ্ঞান তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে পায়, কিন্তু যিনি এ ব্যবস্থা কোরে রেখেছেন সেই মহাব্যবস্থাপককে সে দেখতে পায় না, কারণ তার ডান চোখ অন্ধ।

দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হওয়ায় তার কাছে ন্যায়-অন্যায়ের কোন প্রভেদ নেই। সে নিজের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অন্যায়ভাবে সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ও নির্দয় বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে মোসলেম নামের এই জাতিকে হত্যা কোরে চোলেছে, তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত কোরছে। বিশেষ কোরে বর্তমানে ফিলিস্তিনে যা হোচ্ছে তা একচোখা নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেভাবে সামান্য অজুহাতে নারী, শিশুসহ বেসামরিক জনগণকে হত্যা কোরে চোলেছে। আজ সেখানে মানবতা বলতে কিছুই নেই। বিশ্বের সকল মানবতাবাদীরা আজ নিশ্চুপ। কারণ একচোখা রবের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতেও সাহস কোরছে না। তার বাম চোখ দিয়ে সে সত্য, ন্যায়, সুবিচার, করুণা, প্রেম, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, ধর্ম, মানবতা কিছুই দেখতে পায় না। তাই আজ দাজ্জাল নিয়ন্ত্রিত এ বিশ্ব সংসার থেকে ধর্ম নির্বাসিত হোয়ে গেছে, ন্যায়, সুবিচার আজ অনুপস্থিত, প্রেম, করুণা আজ মানবসমাজ থেকে প্রায় বিলীন হোতে বোসেছে, ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য আজ অপরিচিত। সমগ্র বিশ্ব আজ অশান্তির অগ্নিগোলক হোয়ে আছে। অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত, হানাহানি, চুরি, ডাকাতি, দুর্নীতি, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদিতে বর্তমান পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হোয়ে পো ড়েছে। এ যেন আজ সাক্ষাৎ নরকপুরী।

রসুলাল্লাহ দাজ্জাল সম্পর্কে আরও বলেছেন- **"দাজ্জালের শক্তি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি পৃথিবীর সমস্ত মাটি ও পানি (ভূ-ভাগ ও সমুদ্র) আচ্ছন্ন কোরবে। সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ চামড়া দিয়ে জড়ানো একটি বস্তুর মতো তার করায়ত্ত হবে।** [মুসনাদে আহমদ, হাকীম, দারউন নশুর] আজ দাজ্জাল সম্পর্কিত রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হোয়েছে। সমগ্র পৃথিবী আজ দাজ্জালের করায়ত্ত।

সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় এবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান

রাকীব আল হাসান

প্রথমটা ব্রুনাইয়ের রাজধানীতে অবস্থিত একটি মসজিদ যার গম্বুজটি খাঁটি স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। দ্বিতীয়টি রাশিয়ার একটি গীর্জা যার নয়টি গম্বুজ রয়েছে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। ছবি দু'টি শুধু উদাহরণমাত্র, সকল ধর্মেরই এমন অনেক উপাসনালয় রয়েছে। পর্বতসমান অর্থব্যয়ে এই উপাসনালয় নির্মিত হলেও স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য যারা সেখানে যান তাদের মনে রাখা দরকার, স্রষ্টা থাকেন আর্ত-পীড়িতের সেবায়, ভগ্নহৃদয় আর রুগ্ন শরীরের দুঃখী মানুষের পাশে। কাজেই মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডার অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে মানবতার কল্যাণ করাই বড় এবাদত, বড় পুণ্যের কাজ।

আল্লাহর রসুল এবং প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির মসজিদ থেকে অর্ধ পৃথিবী শাসন কোরেছেন, তাঁদের মসজিদসমূহ কোনোই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তবু যে ভূখণ্ডে এই জাতি শাসন কোরেছেন সেখান থেকে সমস্ত অন্যায় অবিচার, যুদ্ধ রক্তপাত, ক্ষুধা দারিদ্র্য, শোষণ এক কথায় সর্ব প্রকার অন্যায় অশান্তি লুপ্ত হে[illegible] গিয়েছিল। অথচ বর্তমানে সারা দুনিয়াতে এমন [illegible] মসজিদ রোয়েছে যার গম্বুজ সোনার তৈরি। মসজিদগুলির ভেতর, বাহির এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ যে তা রাজপ্রসাদকেও হার মানায়। কিন্তু সমাজ অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রসুল বর্তমানের এই সময়ের অবস্থাকেই বর্ণনা কোরে বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) এসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) **মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না,** (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আল্লাহর রসুলের পবিত্র মুখনিঃসৃত এই বাণীটি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হোয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ এককেটা মসজিদ নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তা দিয়ে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের আহার জুটতে পারে, দীন দরিদ্রের জীবনকে স্বচ্ছল করা যেতে পারে। আমাদের দেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের অলিতে গলিতে রোয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ। শুধু মসজিদ নয় মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিও যে বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরি হয় তাও মসজিদগুলির মতোই। এই ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণসহ সেখানকার ধর্মগুরুদের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষ ব্যয় কোরে [illegible] তা যে কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত [illegible]হুগুণ। অথচ ঐ উপাসনালয়গুলিতে শুধুমাত্র উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজও হয় না। দিনের বেশিরভাগ সময় সেগুলি তালাবদ্ধ থাকে। তবে কি স্রষ্টা আমাদের কাছে শুধুই উপাসনার কাঙাল? স্রষ্টা কি শুধুই উপাসনালয়ের মধ্যে থাকেন? মানুষের সকল কল্যাণ কি শুধু উপাসনার মধ্যেই নিহিত? সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই কি মানুষকে উপাসনায় ব্যস্ত রাখা?

না, ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হোচ্ছে মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানবতার কল্যাণ করা। কিন্তু সকল ধর্মের মানুষই আজ মানবতার কল্যাণের পথ ছেড়ে শুধু উপাসনালয়ে পড়ে থাকাকেই ধর্ম জ্ঞান কোরছে, এবাদত মনে কোরছে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে তার এবাদত করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি (সুরা যারিয়াত ৫৬) সেহেতু আমাদেরকে জানতে হবে এবাদত কাকে বলে। নামাজ রোজা করা, পূজা-অর্চনা, জপমালা জপা, ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় ব্যয় করা ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত এবাদত নয়। এবাদত কথাটির অর্থ হোচ্ছে যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা

হোয়েছে সেই কাজ করা। একটি ঘড়ি তৈরি করা হোয়েছে সময় দেখানোর জন্য, এটা করাই তার এবাদত। সূর্য সৃষ্টি করা হোয়েছে আলো ও তাপ দেওয়ার জন্য, এটা করাই তার এবাদত। মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে সেটা আগে জানতে হবে। কারণ সেটা করাই তার এবাদত। মানুষকে কি মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জা, প্যাগোডায় গিয়ে বোসে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে? না। মানুষকে সৃষ্টি করা হোয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে সত্য, ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। পৃথিবী যখন অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হোয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, উপাসনালয় থেকে জুতা পর্যন্ত চুরি হয়, যে সমাজে চার বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিত হয়, পৃথিবীর মাটি মানুষের রক্তে ভিজে আছে, সেখানে এক শ্রেণির লোক মসজিদে গিয়ে যিকির আজকার করেন আর মনে করেন এবাদত কোরছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন যে উপাসনা হোচ্ছে, মক্কায়-কাশিতে গিয়ে মনে করেন যে, তারা নিষ্পাপ হোয়ে গেছেন। ধর্মগুরুদেরকে অর্থদান কোরে ভাবেন মহাপুণ্যের কাজ কোরছেন আসলে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে আছেন। তাদের এবাদত করা হোচ্ছে না। মানুষের প্রকৃত এবাদত হোল মানবতার কল্যাণে কাজ করা। আল্লাহ বলেছেন, "পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহরই প্রেমে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী (সুরা বাকারা ১৭৭)।

সুতরাং মানুষ কী করলে শান্তিতে থাকবে, দরজা খুলে ঘুমাবে সেই লক্ষ্যে কাজ করাই হোল এবাদত। এটা সকল ধর্মের মানুষের জন্যই কর্তব্য বা এবাদত। এই অর্থে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বে আছেন তারা যদি কোন দুর্নীতি না কোরে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে অবস্থান করেন, মানুষকে শান্তি দেওয়ার কাজ করেন তবে তারাই স্রষ্টার অধিক নিকটবর্তী হবেন। যারা মানবতার কল্যাণে এই কাজগুলি কোরবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম কোরবে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য দরকার হোল নামাজ, রোজা, হজ্বসহ অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগুলি। যেমন একটি বাড়িতে খুঁটি দেওয়া হয় ছাদকে ধোরে রাখার জন্য। যদি ছাদই না দেওয়া হয়, তাহোলে শুধু খুটি গেঁড়ে কোন লাভ নেই। উপাসনাগুলি হোচ্ছে এই খুঁটির মত। তেমনি যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ কোরবে না, তাদের জন্য এই উপাসনাগুলি কোনো কাজে আসবে না। এগুলো তাদেরকে স্বর্গে বা জান্নাতে, হ্যাভেনে নিতে পারবে না। আমাদেরকে বুঝতে হবে, স্রষ্টা শুধু মসজিদে মন্দিরে থাকেন না। তিনি হাদিসে কুদসীতে বোলেছেন, 'আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।' অন্যত্র বোলেছেন, 'বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের নিকটবর্তী কোরে দাও। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' (দায়লামী ও গাজ্জালী)।

রসুলাল্লাহ (দঃ) সমগ্র জীবন ধোরে যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা কিসের জন্য? এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, দুঃখ, দারিদ্র্য, সকল প্রকার বিভেদ দূর করে ঐক্য, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা কোরে প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং যাবার আগে এই শান্তি ও ঐক্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তার হাতে গড়া জাতিটির উপর। এসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই শান্তি প্রতিষ্ঠা। গৌতম বুদ্ধ (আঃ) বুদ্ধত্ব অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করার পর শিষ্যদের উদ্দেশ করে বোলেছিলেন, **"হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্তে কল্যাণ।"** সুতরাং বোঝা গেল, ধ্যান করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণই ছিল বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য। **একইভাবে যীশু (আঃ) ইহুদিদের প্রার্থনার দিন শনিবারে শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন করে অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জকে সুস্থ করে তুলেছেন। (নিউ টেস্টামেন্ট: মার্ক ৩, লুক ১৪)**। সাবাথের দিনে তিনি কেন মানুষের এই কল্যাণগুলি কোরলেন, ধর্মজীবী রাব্বাই সাদ্দুসাইদের দৃষ্টিতে এটাই ছিল যীশুর মহাপাপ। তাই তারা তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষসহ রাষ্ট্রশক্তিকে উস্কিয়ে দিয়ে তাঁকে একেবারে হত্যা করে ফেলার ষড়যন্ত্র কোরেছে। এভাবেই সকল নবী ও রসুল তাদের জীবন ও কর্ম দিয়ে মানুষের কষ্ট দূর করাকেই ধর্ম বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। মানুষের শান্তিই সকল ধর্মের আত্মা। ওঙ্কার ধ্বনীর অর্থ শান্তি, এসলাম শব্দের অর্থও শান্তি, আবার বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য **"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু- জগতের সকল প্রাণি সুখী হোক।"** যে ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সেটা আত্মাহীন ধর্মের লাশ। প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সেটা আর আলো দিতে পারে না, দিতে পারে শুধু কালি। তাই আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলি চালু আছে সেগুলোর বিকৃত অনুসারীরা মানুষকে আলোকিত করার বদলে কালিমালিপ্ত কোরছে, শান্তির বদলে বিস্তার কোরছে সন্ত্রাস। তারা ভুলেই গেছে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

ধর্মকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে ঢুকিয়েছে স্বার্থান্বেষী একশ্রেণির ধর্মজীবীর দল। এই পরাশ্রয়ী ধর্মজীবী শ্রেণিটি সকল ধর্মেই বিদ্যমান। এরা ধর্মকে বানিয়েছে তাদের বাণিজ্যের মূলধন, পুঁজি। নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে কোরেছে বিকৃত। এদের সামনে যত অধর্মই হোক, যত অন্যায়, অবিচার হোক এরা কোন প্রতিবাদ না কোরে মাথা নিচু কোরে মসজিদে, মন্দিরে, প্যাগোডায়, গীর্জায় গিয়ে ঢুকবে। এদের গায়ে যেন ফুলের টোকাও না পড়ে এ জন্য এরা উপাসনালয়ে ঢুকে নিরাপদ এবাদতে মশগুল

থাকে। মানবতার কল্যাণ, মানবজাতির শান্তি নিয়ে এদের কোন চিন্তা নেই, যত বেশি মানুষ নামাজ পোড়বে, যত বেশি মানুষ পূজা কোরবে ততই এদের লাভ। দানবাক্স ভর্তি হবে, তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই তারা নির্যাতিত মানুষের শান্তি-অশান্তির দায়িত্ব শয়তান, অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মসজিদ, মন্দির, গীর্জায়, প্যাগোডায় ঢুকেছেন। তারা ধর্মকে বাস্তবজীবন থেকে অপসারণ করে উপাসনা, পূজা-প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত কোরেছেন।

এমনই এক অন্ধকার সময়ে, শত শত বছর পূর্বে হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি ধর্মের সেই প্রকৃত শিক্ষাকে মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছেন এক মহামানব এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি ধর্মের আত্মা ফিরিয়ে এনেছেন। ধর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নাই, কিন্তু আত্মাহীন ধর্মও মানুষকে মুক্তি দিতে অক্ষম। কাজেই এখন মানবতার কল্যাণের জন্য, মানবজাতির ঐক্যের জন্য সকলকে যামানার এমামের ডাকে সাড়া দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে। ধর্মকে চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত কোরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোরতে হবে। সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ, জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা, প্যাগোডা, আলিশান মন্দির নির্মাণের চেয়ে মানবতার কল্যাণ করা এখন জরুরি। নিরন্নকে অন্নদান, নির্বসনকে বস্ত্রদান, অসহায়, দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি বন্ধ করাই এখন আসল এবাদত।

আজকের ইহুদিবাদী ইসরাইল কোথা থেকে এলো

রাকীব আল হাসান

ইহুদিবাদ ও ইহুদি ধর্ম এক কথা নয়। ফিলিস্তিনে জোর জবরদস্তিমূলকভাবে ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করা এবং পরবর্তীকালে সমগ্র দুনিয়ায় ইহুদিদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে যে আন্দোলন উনিশ শতকের শেষভাগে শুরু হোয়েছে তা-ই ইহুদিবাদ। ইংরেজিতে এ আন্দোলনের নাম হোয়েছে Zionism (জাইওনিজম)। নিঃসন্দেহে গত দুইশ' বছরের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের যেসব ঘটনা ঘোটেছে তার মধ্যে সবচেয়ে কষ্টদায়ক হলো- ইহুদিবাদীদের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জবরদস্তিমূলকভাবে দখল ও তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন।

স্রষ্টার নিকট থেকে আগত সকল ধর্মই মূলত মানবতার কথা বলে। কিন্তু ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী, স্রষ্টাহীন, ধর্মহীন, চাকচিক্যময় 'সভ্যতা' তথা দাজ্জাল মুখে মানবতার ধুয়া তুললেও তারা চরম অমানবিক কাজ করে চোলেছে বিগত পাঁচশ' বছর ধরে। ইহুদি-খ্রিস্টান 'সভ্যতা' দাজ্জালের প্রধান ভাগ ইহুদিদের অপরাধপ্রবণতা নতুন কিছু নয়। তারা হাজার হাজার বছর ধরে অপরাধ কোরে আসছে এবং এর যথেষ্ট দণ্ডও তারা পেয়েছে।

ইহুদি জাতির উৎপত্তি:

এব্রাহীম (আ:)- এর এক পুত্র এসহাক (আ:) এবং এসহাকের (আ:) পুত্র ছিলেন এয়াকুব (আ:)। এয়াকুবের (আ:) অপর নাম ছিল ইসরাইল যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। এয়াকুব (আ:) তথা ইসরাইলের বংশধররাই হলো বনী ইসরাইল যারা পরবর্তীতে এয়াকুবের (আ:) পুত্র ইয়াহুদার নামানুসারে নিজেদেরকে ইয়াহুদি বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। ইয়াকুব (আ:) ছিলেন নবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী। তাঁর জাতি বনি ইসরাইল ছিল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। কিন্তু তারা সীমালঙ্ঘন কোরেছে বার বার। মুসার (আ:) সময় আল্লাহ এই জাতির পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে ফেরাউনের কঠোর নির্যাতন থেকে অলৌকিকভাবে পরিত্রাণ দেন এবং ফেরাউনসহ তার দলবলকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন। এরপর তাদের প্রখর রোদ থেকে পরিত্রাণের জন্য মেঘমালা ছায়া প্রদান করে, তাদের খাবারের জন্য আল্লাহ আকাশ থেকে মান্না-সালওয়া নামক খাবার পাঠান। কিন্তু এই জাতি আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে বার বার সীমালঙ্ঘন করে এবং অনেক নবীকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা নবী হান্নানী (আ:), ইলিয়াস (আ:), ইরমিয়া বা জেরেমিয়া (আ:), ইয়াহিয়া (আ:) ইত্যাদি নবীগণকে অকথ্য নির্যাতন করে এবং অনেককে হত্যা করে। সর্বশেষ ঈসা বা যিশু (আ:) তাদেরকে সত্য পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালে ঈসাকেও (আ:) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এভাবে তারা একের পর এক অপরাধ করতেই থাকে। ফলে একসময় আল্লাহ তাদের উপর লানৎ দেন। তাদের উপর নেমে আসে ভয়ঙ্কর আযাব।

ইহুদিদের উপর আল্লাহর লানতের ফল:

আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃস্টপূর্ব ৭২৪ সালে ইসরাইল রাজ্য আক্রমণ কোরে হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা করে এবং কয়েক হাজার ইহুদিকে বেঁধে নিয়ে যায় দাস হিসাবে। খৃস্টপূর্ব ৫৬১ সালে ব্যবিলনের শাসক বখত নছর জেরুজালেম আক্রমণ করে শহরটিকে লণ্ডভণ্ড করে দেয় এবং ৭০ হাজার ইহুদিকে বন্দী করে নিজ দেশে

নিয়ে যায়। ৭০ ঈসায়ী সালে রোমীয়গণ ইহুদিয়া রাজ্য আক্রমণ করে এবং হাজার হাজার ইহুদি হত্যা করে। ১৩২ সালে রোমীয়গণ পুনরায় ফিলিস্তিনে আক্রমণ করে এবং ইহুদিদের সেখান থেকে বের করে দেয়। পরপর বৈদেশিদের আক্রমণ ও রোমীয় শাসকদের নির্যাতনে বাধ্য হয়ে ইহুদি জাতি বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়ে এবং এভাবে সারা দুনিয়ায় এরা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পৃথিবীর কোথাও এদের আবাসভূমি বলতে কিছু রইল না। যে দেশেই গিয়েছে শুধু ঘৃণা আর লাঞ্ছনাই জুটেছে তাদের কপালে। এটা ছিল আল্লাহর লানৎ এবং তাদের অভাবের কারণে। তারা যেখানেই গেছে সেখানেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের স্বার্থলিপ্সায় স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষতিসাধন কোরেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে তাদেরকে বার বার নির্মমভাবে বিতাড়িত করা হোয়েছে। ১২৯০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ইহুদিদেরকে বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথম দফা ১৩০৬ সালে এবং দ্বিতীয় দফা ১৩৯৪ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করে। ১৩৭০ সালে বেলজিয়াম এবং ১৩৮০ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া ইহুদিদেরকে নির্বাসিত করে। ১৪৪৪ সালে হল্যান্ড এবং ১৫৪০ সালে ইটালি তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ১৫১০ সালে রাশিয়া এবং ১৫৫১ সালে জার্মানি থেকে তারা বিতাড়িত হয়। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ইহুদিদের উপর পাইকারী হারে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা সকলেরই জানা।

ইহুদিবাদী ইসরাইলের জন্ম:

কোন জাতি যত ছোটই হোক যদি তাদের মধ্যে ঐক্য থাকে তবে তাদের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারে না। ইহুদিদের এই ঐক্যের বলে সামান্য ২ কোটির ইহুদি জাতি ১৬০ কোটির মোসলেম জাতির উপর নির্যাতন চালায় আর সমগ্র মোসলেম বিশ্ব চেয়ে চেয়ে দেখে। ইহুদিবাদীরা গত কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনি জাতির ওপর চরম দুঃখ-দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে। সেখানে চালানো হোচ্ছে জাতিগত নিধনযজ্ঞ। ফিলিস্তিন দখল করে সেখানে এমন একটি অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকেই সংকটের গভীরে নিক্ষেপ কোরেছে। অবৈধ ইসরাইলের কারণে গত ৬৬ বছর ধরে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই অশান্তি ও অনিরাপত্তার আগুনে জ্বলছে।

মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রে ইহুদিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পেছনে সুদূরপ্রসারী অশুভ লক্ষ্য কাজ কোরেছে, তা বোঝা যায় ইতিহাস ঘাটলেই। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধিপত্যের বলয় বাড়ানো নিয়ে তিন ইউরোপীয় দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে প্রতিযোগিতা চোলছিল। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তারা নানা অপকৌশল অবলম্বন কোরছিল। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপরও তাদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। কারণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কোরেছে এই ফিলিস্তিন। ভৌগোলিক দিক থেকে এটি একটি কৌশলগত অঞ্চল। একদিকে যখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লব চোলছিল তখন মোসলেমদের মধ্যে চোলছে চরম অনৈক্য আর ফেরকাবাজী। নিজেদের কর্মফলস্বরূপ অটোম্যান তথা ওসমানীয় সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসমুখে তখন ইউরোপ বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পায়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ও মোসলেম বিশ্বের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৮৯৭ সালে থিয়োডর হার্জেল ও তার সহযোগীরা সুইজারল্যান্ডে এক সমাবেশের মাধ্যমে বিশ্ব ইহুদিবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। হার্জেল পরবর্তীতে ইহুদিবাদের জনক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদিবাদীদের নানা ষড়যন্ত্রের মাঝেই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধে নয়া শক্তির সমীকরণের এক পর্যায়ে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এরপর বিশ্ব ইহুদিবাদ সংস্থা নতুন কোরে শক্তি সঞ্চয় করে। ১৯১৭ সালে উপনিবেশবাদী ব্রিটেন ও বিশ্ব ইহুদিবাদের মধ্যে সম্পর্কের নয়া অধ্যায় শুরু হয়। ওই বছর তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। ১৯১৮ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘ ফিলিস্তিনের ওপর ব্রিটেনের একাধিপত্যকে স্বীকৃতি দেয়। তিন দশক ধরে ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে ছিল ফিলিস্তিন। এই তিন দশকে বিশ্ব ইহুদিবাদ সংস্থা ফিলিস্তিনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফিলিস্তিনের দিকে ইহুদিদের ঢল নামে। ১৯৪১ সালের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদি আমদানি করে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৫০,০০০। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের অজুহাতে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) ইহুদিকে ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন করা হয়। ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করে ইহুদিবাদীদের জন্য স্থায়ী আবাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। শক্তি প্রয়োগ কোরে ফিলিস্তিনিদেরকে ভিটেমাটি ছাড়া করা হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনকে ভাগ করার ইশতেহার প্রকাশ করে। এরই ভিত্তিতে ফিলিস্তিনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক অংশ দেয়া হয় ইহুদিবাদীদেরকে। সেখানে তারা ইহুদি সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অন্য অংশ দেয়া হয় ফিলিস্তিনিদেরকে। একপেশে ওই ইশতেহারে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্য ফিলিস্তিনের মোট ভূখণ্ডের অর্ধেককে বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু বিশ্বের মোড়লদের ইহুদিবাদপ্রীতির কারণে আজও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডেও মোতায়েন রয়েছে ইহুদিবাদী বাহিনী। ইশতেহার প্রকাশের এক বছর পর ফিলিস্তিন অংশটিও ইহুদিবাদীরা দখল করে নেয়। এর ফলে সেখানে নেমে আসে হাহাকার। তারা হয়ে পড়েন সহায়-সম্বলহীন। ১৯৫০'র দশকে ইহুদিবাদী ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মায়ার বোলেছিলেন, "ফিলিস্তিনের বর্তমান প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন কোরতে হবে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্ম আর ফিলিস্তিনের কথা মনেই কোরতে পারবে না।" ফিলিস্তিন ভূখণ্ড ইহুদিদের ভূখণ্ড বলেও তিনি জোর গলায় দাবি কোরেছিলেন। ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু ফিলিস্তিন নয় গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্যই দুঃখ-দুর্দশার কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

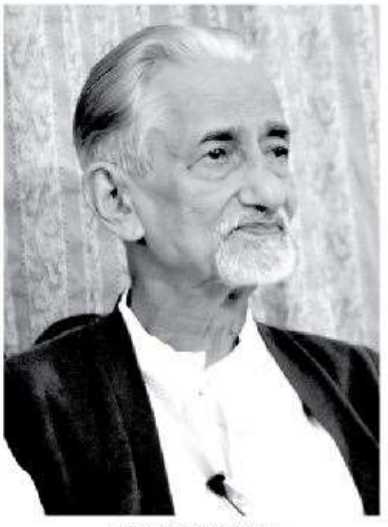

মহামান্য এমামুয্যামান
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এমামুয্যামানের যোগসূত্র

মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন ঐতিহ্যবাহী পন্নী জমিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। সুলতানী যুগে এবং মোগল আমলে এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন অত্র এলাকার শাসক। এমন কি তারা দীর্ঘকাল বৃহত্তর বাংলার (তদানীন্তন গৌড়) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিবারের কীর্তি এক সূত্রে গাঁথা। বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এমামুয্যামানেরই পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নী (কররানি)। এ ব্যাপারে একটি ভুল ইতিহাস চালু আছে, বলা হোয়ে থাকে বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, কিন্তু এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জনাব হায়দার আলী চৌধুরী রচিত 'পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ' নামক ইতিহাস গ্রন্থে তিনি উল্লেখ কোরেছেন যে, "স্বাধীন নবাব বোলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! স্বাধীন নবাব কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না (পৃষ্ঠা: ৭৭)"। তাঁর এই কথা অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ নবাব শব্দটি আরবি নায়েবের অন্যতম রূপ। আর নায়েব মানেই শাসকের প্রতিনিধি। সিরাজউদ্দৌলাহ ছিলেন মোগল শাসকদের নিয়োজিত সুবেদার। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে বাংলার শাসনে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা সিরাজউদ্দৌলাহ নন। সিরাজউদ্দৌলাসহ তার পূর্বসূরী নবাব আলীবর্দী খানসহ সবাই ছিলেন তৎকালীন দিল্লির মসনদে আসীন মুঘল সম্রাটদের অনুগত প্রতিনিধি। প্রকৃতপক্ষে বাংলার স্বাধীন শাসক এবং স্বাধীনতা গত হয় আরো অনেক আগে। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সত্যিকার ইতিহাস জানতে ফিরে যেতে হবে আরো পেছনে।

মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর পূর্বপুরুষ দাউদ খান পন্নীর পরাজয় এবং হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মূলত: বাংলার শাসন ক্ষমতা থেকে 'স্বাধীন' শাসকের অবসান ঘটে। সুতরাং ১৭৫৭ সালের ২৩ ই জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা নন, ১৫৭৬ সনের ১২ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খান পন্নীর অবসানের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর শুধু পন্নী বংশই নয়, কোন শাসকই আর স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কোরতে সক্ষম হন নি। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমাণ্ডার ও জমিদারগণ দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে অবশ্য তারাও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার কোরতে বাধ্য হন। মুঘলদের অধীনস্থ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ধীরে ধীরে শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চোলে যায়।

ব্যক্তিজীবন:

আমাদের এই উপমহাদেশসহ সমগ্র পৃথিবী যখন খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত বিশেষ কোরে মোসলেম বিশ্ব যখন ইহুদি-খ্রিস্টানদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ এই জাতির উপর

সদয় হোলেন, তিনি পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর মনোনীত একজন মহামানব, এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে। মাননীয় এমামুয্‌যামান ১৫ শাবান ১৩৪৩ হেজরী মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ শেষ রাতে জন্মগ্রহণ করেন। এমামুয্‌যামানের রোয়েছে এক কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন-ইতিহাস। তাঁর শৈশব কাটে করটিয়ার নিজ গ্রামে। ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্তে তরুণ এমামুয্‌যামান আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল শিকারের শখ। শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা 'বাঘ-বন-বন্দুক' (১৯৬৪) নামক বইটি খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সনে এমামুয্‌যামান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য অর্থাৎ এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ নজরুল একাডেমির একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। পরবর্তীতে তিনি সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন নামে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নের জন্য একটি দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সত্যের মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সত্য সন্ধান এবং সত্যের জন্য লড়াই কোরে গেছেন। তাঁর ৮৬ বছরের জীবনে একবারের জন্যও আইনভঙ্গের কোন রেকর্ড নেই, নৈতিক স্খলনের কোন নজির নেই। আধ্যাত্মিক ও মানবিক চরিত্রে বলীয়ান এ মহামানব সারাজীবনে একটিও মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। ১৬ জানুয়ারি ২০১২ ঈসায়ী এই মহামানব প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে পর্দাগ্রহণ করেন।

মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্‌যামানের ভাবনাঃ

ভেদাভেদ আর হানাহানিতে লিপ্ত অন্য জাতিগুলি দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত মোসলেম জাতি সম্পর্কে এমামুয্‌যামান ভাবতেন ছোট বয়স থেকেই। ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লান্‌ছিত এবং অপমানিত?

সত্যের সন্ধান লাভঃ

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষাণুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে *(Super power)* সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত কোরে ফেলল, তাও